পারিবে। তবেই সর্ব্বাঙ্গ শিক্ষা বিস্তার করিতে পারিবে, তবেই একদিন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইবার ব্যবস্থা।

বাঙ্গালায় একটী কবিতা আছে,

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।

এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে চলিবে না, তাহাতে আত্মগৌরব খর্ব্বই হইবে। যাহাদের ধারণা আর্য্য চিকিৎসা যে অনভিজ্ঞনোচিত, অবজ্ঞার বিষয়, আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিলে তাহাদের সে ধারণা দৃঢ়মূল হইবে। নিজের, পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা হইবে। অনেক মহাত্মার হয়ত ধারণা থাকিতে পারে যে কবিরাজি শিক্ষা করিতে গিয়া আয়ুর্ব্বেদের অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিতে যদি ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সার্থকতা কি থাকিল। কিন্তু একথা আদৌ সঙ্গত নহে, কারণ বর্ত্তমান যুগে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ, চিকিৎসা ব্যবসায়ী মহোদয়গণ, শিক্ষার অভাবে যন্ত্র, শস্ত্রাদির শিক্ষা দিতে অক্ষম, কাজেই পাশ্চাত্য চিকিৎসায় শিক্ষিত মহোদয়গণের সাহায্যে শল্যতন্ত্র সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাতে দোষ কি? তাহাতে ভবিষ্যতে আর্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পূর্ব্ব সমৃদ্ধিই বজায় থাকিবে।

শল্যতন্ত্র বক্তা ধন্বন্তরিই উপদেশ দিয়াছেন,

"অন্যশাস্ত্র বিষয়োপপন্নানাঞ্চার্থানাঞ্চার্থানা মিহোপ নিপতিতানামর্থবশাত্তেষাং তদ্বিদেভ্য এব ব্যাখ্যা মন্থ শ্রোতব্যং। কস্মাৎ ন হ্যেষ্মিন্ শাস্ত্রে শক্যঃ সর্ব্ব শাস্ত্রানামবরোধঃ কর্ত্তুং॥

এই চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রয়োজন বশতঃ অন্য শাস্ত্রের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে তত্ত্বদর্শী আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও অন্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে, ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অর্থাৎ শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যদি কিছুদিন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসক মহোদয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে ঋষিমতের অবমাননা হইবে না, বরং তাহাতে স্তিমিত উজ্জ্বল আলোকে দিগ বিভাষিত করিবে সন্দেহ নাই—

একংশাস্ত্র মধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্র
নিশ্চয়ং।
তস্মাদ্ বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়া
চ্চিকিৎসকঃ॥
শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্ গীর্ণমাদায়ৈ।
পাস্ত চামরুৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ
সর্ব্বৈর্দ্বো হন্যেতু তস্করাঃ॥

রোগ আরোগ্য আয়ুর্ব্বেদের শক্তি।

(শ্রীরাজেন্দ্র কুমার মজুমদার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

আমাদের দেশে যখন বৈদেশিক চিকিৎসার প্রভাব বিস্তার হইতেছিল, তখন হইতে আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা করিয়াছি। অনেক সময় কিন্তু চিকিৎসা-বিভ্রাটের দরুণ রোগীর পঞ্চত্ব পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায়। আমি আজ দু' একটী রোগীর রোগ বিবরণ প্রদান করিতেছি,—আয়ুর্ব্বেদের মহত্ব প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিতেছি বলিয়া মনে করিব। কিছুকাল যাবত আয়ুর্ব্বেদের প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, মধ্যযুগে এমনটী ছিল না, তখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণকে বিশেষভাবে অগ্রাহ্য করা হইত। এখন লোকের মন হইতে সেই ভাব দূরীভূত হইলেও কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্য করণের অদ্ভুত শক্তিতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা শিশুকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছি আমাদের বাড়ীতে কবিরাজ ও ডাক্তার থাকিতেন, তখন হোমিওপ্যাথির এমন আদর ছিল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পাড়াগাঁয় কেন, সহরেও মিলিত না। এখন দুইখানি কেতাব, একটা বাক্স ও কয়টা ক্ষুদ্র শিশি হইলেই হোমিওপ্যাথ হওয়া চলে, যাহাদের অন্য কোন গতি নাই, তাহারাই পাড়াগাঁয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সাজেন। কিছুনা বুঝিলেও তাঁদের একটা থার্ম্মমেটার ও একটা টেথিসকোপ চাই।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা একবার পীড়িত হইল,—সে অনেকদিনের কথা। তাহার বয়স তখন প্রায় দশ বৎসর, রোগ জ্বর, প্লীহা ও যকৃতের দোষ বর্ত্তমান। বাড়ীর ডাক্তার দেখিতেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ পড়িত, বাড়ীর ডাক্তার রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পরাস্ত হইলেন, রোগী ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। অন্যত্র হইতে ডাক্তার আনিয়া দেখান গেল, ঔষধ ও পথ্যের পরিবর্ত্তন হইল। পথ্য ও ঔষধ তেজস্কর, কিন্তু রোগী একবারে দুর্ব্বল। রোগী কৃশ, কিন্তু উদরের পীড়া ও শোথ ধরিয়া রোগী একবারে বৃহৎকায় হইয়া পড়িল। তাহার চোখ, মুখ একবারে একাকার হইয়া গিয়াছিল, হাত, পা প্রকাণ্ড, চেনা যাইত না, দেখিলে ভয় হইত, রোগীর সেই ভীষণ চেহারা এখনও মনে হইলে বুক কাঁপিয়া উঠে। রোগীর এই অবস্থায় আমরা একবারে তাহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলাম। সকলেই একবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে ৺রূপচন্দ্র দাস নামে একজন প্রাচীন কবিরাজ থাকিতেন, তিনি বিখ্যাতনামা কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺বিজয়রত্ন সেনের দাদা-শ্বশুর। কবিরাজ মহাশয় আমাদের বাড়ীতে পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল ছিলেন। মা তাহাকে আর বাঁচাইতে পারিলেন না বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কবিরাজ মহাশয়ও রোগী দেখিতেন, কিন্তু তিনি

ডাক্তারও ডাক্তারী ঔষধের নিন্দা করিতেন। ডাক্তার আসিলে তিনি বাহির বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন ও দুঃখ প্রকাশ করিতেন। রোগীর আশা ছাড়িয়া একদিন মা, কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন—"কবিরাজ রোগীর আশা ত ছাড়িয়াছি, এখন তুমি একবার শেষ দেখা দেখ।" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "এখন শেষ সময় আমাকে কেন? আগে বলিলে হয়ত রোগীর এমন দশা হইত না। আমি বলিয়াছি কেহ আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। যদি ইহার আয়ু থাকে তবে আমার ঔষধে ভাল হইবে, বিশ্বাস করি।" সকলেই তাঁহার চিকিৎসাধীন হইতে মত প্রকাশ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দেওয়া আরম্ভ করিলেন। পথ্য একবারে বদলাইয়া গেল। তিনি বলকর ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন না, সমস্ত শরীরে ছাই মাখাইয়া থাকার ব্যবস্থা হইল। ঔষধে ক্রমে শোথ কমিয়া আসিতে লাগিল, উদরের পীড়াও সারিয়া আসিল, অতি অল্প দিনেই এইরূপ অভিনব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। কিছুদিন পরে জ্বর সারিয়া গেল। রোগী যখন হাঁটিতে আরম্ভ করিল, তখন সকলের মনেই আনন্দের সঞ্চার হইল, সকলে আয়ুর্ব্বেদের শক্তি দেখিয়া কবিরাজ ও তাঁহার ঔষধের শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার সেই ভ্রাতা এখন রেঙ্গুন চিফ্ কোর্টের উকীল। যদি তাহাকে ডাক্তারের হাতেই রাখা যাইত তবে আর তাহাকে পাইতাম না। আমাদের কবিরাজ মহাশয় ডাক্তারের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কখনো চিকিৎসা করিতেন না। তিনি ডাক্তারদিগকে যমকিঙ্কর বলিতেন। বাস্তবিক ডাক্তারী চিকিৎসা যে কোন কাজের নহে এ কথা আমরা বলিতে পারি না, সকল অবস্থায়, সব সময়, সব রোগীতে ডাক্তারী ঔষধে কাজ হয় না—বরং কোন কোন স্থলে বিষবৎ ক্রিয়া করে।

একবার আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, সেই সময় আমি পড়া ত্যাগ করি। ময়মনসিংহের সিবিলসার্জ্জন ও তাঁহার অধীনে একজন ডাক্তার আমায় চিকিৎসা করেন, ফলের বেলায় যখন অপক্ক রম্ভা—তখন ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ কবিরাজের হাতে পড়িলাম, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একজন হাতুড়িয়া গোছ কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জেদ করিয়া কহিলেন আমাকে ভাল করিবেন। তিনি বিশিষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কাছে কবিরাজী পড়িয়াছেন বলিলেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিলাম না, তথাপি তাঁহার হাতেই আমার চিকিৎসার ভার পড়িল। ডাক্তার যেরূপ পথ্য ও উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি তাহা উল্টাইয়া দিলেন। ডাক্তার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বলিয়া মাথায় শৈত্য ক্রিয়াও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিরাজ তাহা উল্টাইয়া মাথায় গরম অর্থাৎ মাষকলাইয়ের স্বেদ ও সাধারণ পথ্যের সঙ্গে মাখন খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। মাথায় দু'বেলা আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল ও বড়ীর ব্যবস্থা করিলেন। আমি অচিরেই ভাল হইয়া গেলাম। আমার পূর্ণ জ্ঞান আসিয়া পড়িল, আমি তখন লোক চিনিতে পারিতাম। বোধ হয় মাথায় শ্লেষ্মা জমিয়াই এরূপ হইয়া

থাকিবে। কবিরাজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কফ-বায়ুর বিকার।

আমার একজন হিন্দু প্রজার পুত্রের জ্বরবিকার হয়, গ্রাম্য ডাক্তার আনা হইল। তাহার বাড়ী আমার বাড়ী হইতে একমাইল। ডাক্তার বলিলেন,—রোগী অচিরেই মারা যাইবে, ধন্বন্তরিরও অসাধ্য রোগী। ডাক্তার আসিয়াছিলেন আমারই হাতীতে, গেলেনও তাহাতেই। ডাক্তার চলিয়া গেলে রোগীর পিতা আমার বাড়ী কবিরাজের নিকট দৌড়িয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"কবিরাজ মহাশয় ইহাকে বাঁচাইয়া দিন, যেমন করিয়া পারি আপনাকে খুসী করিব। আমি গরীব, যে কিছু টাকা ছিল সহরের ডাক্তারকে দিয়া বিদায় করিয়াছি।" ফলে অনেক স্থলেই দেখা যায়, ডাক্তারকে টাকা কড়ি দিয়া ফৌত হইয়া তখন সামান্য পয়সায় কবিরাজ-দেখায় ও সে গরীব সাজে। যাহাহউক আমিও প্রজাটির অনুরোধে কবিরাজ সহ তাহার বাটীতে গেলাম। রোগী দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন—"যমের সাধ্য নাই এ রোগী নিতে পারে,তবে ঔষধ ও শুশ্রূষা যদি রীতিমত হয়।" এই সময় তাহারা খুব সাহস পাইয়া কবিরাজী ঔষধ দিতে প্রস্তুত হইল। কবিরাজ মহাশয় সর্ব্বপ্রথমেই সূচিকাভরণের ব্যবস্থা করিলেন। মাথার চুল কাটিয়া মাথার তালুতে রক্ত বাহির করিয়া ঔষধ বসাইয়া দিয়া শুশ্রূষার কথা বলিয়া দিলেন। পথ্যের ব্যবস্থা অদ্ভুত। দধি-ঘোল আর ভাতের মাড়। ক্রমে রোগী ভাল হইয়া উঠিল, সে কবিরাজ ও রোগী এখনও বাঁচিয়া আছেন।

বিলাতী বা বৈদেশিক ঔষধ ও পথ্য আমাদের সহ্য হইবার নহে। ইহা সে দেশীয় লোকের জন্য সে দেশের ঔষধ। শীতপ্রধান দেশের উগ্র ঔষধে আমাদের উপকার না করিয়া অপকারই করে। তবে কোন কোন অবস্থায় ডাক্তারী ঔষধ যে ফলপ্রদ সে কথা অস্বীকার করি না। সালসায় আমাদের যে কাজ না করে, তোপ্‌চিনী তদপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকে ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তোপচিনীর রোগীও অনেক আমি দেখিয়াছি, সালসায় রোগীও বহুতর দেখিয়াছি। সালসা অপেক্ষা তোপচিনীতে খরচও কিছু কম পড়ে। কবিরাজী চ্যবনপ্রাশ—ডাক্তারী কড্‌লিভার অয়েল অপেক্ষা অনেক কার্য্যকারী। আমরা এমনই হইয়া পড়িয়াছি যে, চ্যবনপ্রাশকে দূরে রাখিয়া কড্‌লিভার অয়েলেরই আদর করিয়া থাকি। এক মকরধ্বজের মত কোন ঔষধই কোন চিকিৎসাশাস্ত্র বাহির করিতে পারিল না। আর কত কহিব, আয়ুর্ব্বেদের সকল ঔষধই যে ফলপ্রদ তাহা বলা বাহুল্য। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি আমাদের দেশের উপযোগী ও শরীরের পক্ষে হিতকর। আমাদের বিকৃত বুদ্ধি দূর হইলে আয়ুর্ব্বেদের আদর আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। দেশে যেমন হাওয়া বহিতেছে তাহাতে মনে হয় অচিরেই আয়ুর্ব্বেদ পূর্ব্বের ন্যায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। উল্লিখিত প্রকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে ও প্রবন্ধ বিস্তৃতির আশঙ্কায় তাহা লিখিতে বিরত রহিলাম।

শারীর বিদ্যা।

সন্ধি ও স্নায়ু।

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল,এম, এস)

সন্ধি*—অস্থির সহিত অস্থির সংযোগকে সন্ধি বলে। এই সংযোগে অস্থিগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, জুড়িয়া এক হইয়া যায় না। শরীরে কেবল যে অস্থির সন্ধিই আছে তাহা নহে—পেশী, সিরা, স্নায়ু প্রভৃতিরও সন্ধি আছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সন্ধি বলিতে কেবল অস্থিসন্ধিই বুঝায়। পেশী, সিরা প্রভৃতির সন্ধি অসংখ্য†। এই জন্য সেগুলির পৃথক বর্ণনা করা হয় না।

সন্ধি প্রধানতঃ দুইপ্রকার—চেষ্টাবান্ বা সচল এবং স্থির বা অচল। যে সন্ধির অস্থিগুলি চালনা করিতে পারা যায়, তাহাকে চেষ্টাবান্ বা সচল সন্ধি বলে—যেমন হস্তপদাদির সন্ধি। আর যেরূপ সন্ধি ঘটিলে অস্থিগুলির চালনা করিতে পারা যায় না, তাহাকে স্থির বা অচল সন্ধি বলে—যেমন মস্তকের কপালাস্থিগুলির সন্ধি।

সচল সন্ধি আবার দুই প্রকার—বহুচল, যেমন হস্তপদাদির সন্ধি এবং অল্পচল—যেমন পৃষ্ঠবংশের সন্ধি। সুতরাং সন্ধিগুলিকে বহুচল, অল্পচল এবং অচল এই তিন শ্রেণীতেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে শাখা সমূহে ও অধোহনুকোটীতে বহুচল, পৃষ্ঠবংশাদিতে অল্পচল এবং অন্যত্র অচল সন্ধি আছে।

সচল সন্ধিস্থলে দুই বা তিন খানি অস্থি ঘন ও মসৃণ শণরজ্জুবৎ স্নায়ু দ্বারা বা কোষাকার স্নায়ু দ্বারা পরস্পর অবদ্ধ থাকে‡। অস্থি সকলের সন্ধেয় অংশ তরুণাস্থি দ্বারা আবৃত এবং শ্লেষ্মধরাকলাসমাচ্ছন্ন থাকে। এজন্য অস্থিগুলি সন্ধির মধ্যে ঘষিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং সুচারুরূপে খেলিতে পারে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, চক্রের অক্ষ বা চক্রনধ্যস্থ দণ্ড তৈলাভ্যক্ত থাকিলে চক্র যেমন সুচারুরূপে ঘুরিতে পারে, সন্ধিসকল সেইরূপ শ্লেষ্মলিপ্ত থাকায় সুচারুরূপে চালিত হইয়া থাকে*।

অচল সন্ধিসমূহ কোথাও স্নায়ুজাল দ্বারা আবদ্ধ, কোথাওবা দুইখানি অস্থির দন্তুর ধারাদ্বয়ের সম্মিলনে নির্ম্মিত। অপ্রয়োজন হেতু এই সকল সন্ধিতে তরুণাস্থি বা শ্লেষ্মধরা কলা কলা থাকে না।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—"আকৃতি ভেদে সন্ধি সকল আট প্রকার, যথা—কোর, উদূখল,

---

* ইং—Joint, Articulation—জয়েণ্ট, আর্টিকুলেশন।

† অস্থাস্ত সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশী-স্নায়ু-সিরাণাস্ত সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে॥
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ।

‡ স্নায়ু অর্থে Nerve নহে, Ligaments এবং Tendons—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* স্নেহাভ্যক্তে যথা অক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা।
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ।

সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত। তন্মধ্যে অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্‌ফ, জানু ও কূর্পরে কোর; কক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও দন্ত মূলে উদূখল, স্কন্ধ, যোনি ও নিতম্বে সামুদ্গ; গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশে প্রতর; মস্তক, কটী ও কপালে তুন্নসবনী; চোয়াল ও উরুতে বায়সতুণ্ড; কণ্ঠনলীতে মণ্ডল এবং কর্ণে শঙ্খাবর্ত্ত সন্ধি আছে।" প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইতেছে।

কোর—নামক সন্ধিগুলি বহুচল অর্থাৎ খুব খেলে। একখানি অস্থির কোর অর্থাৎ গর্ত্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট খাতের মধ্যে অপর একখানি অস্থির উন্নতভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এই সকল সন্ধি নির্ম্মিত হয়। খল্লকোর, পরস্পরকোর, চক্রকোর এবং সন্দংশকোর ভেদে কোরসন্ধি চতুর্ব্বিধ দেখা যায়। (ক) একখানি অস্থির খলের ন্যায় গভীর খাতের মধ্যে অপর একখানি বা ততোধিক অস্থির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এইরূপ সন্ধি নির্ম্মিত হয়। খলের মধ্যে নোড়ার ন্যায় এই সন্ধির অস্থিগুলি প্রধানতঃ অগ্রপশ্চাৎ দুইদিকে মাত্র খেলে; মণিবন্ধ এবং গুল্‌ফে 'খল্লকোর'† সন্ধি আছে। (খ) দুইখানি অস্থির ঘোড়ার জিনের ন্যায় সন্ধের অংশদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে তাহাকে "পরস্পরকোর"‡ বলে। অঙ্গুষ্ঠমূলে এইরূপ সন্ধি আছে। (গ) যে সন্ধিতে এক অস্থির গোলাকার গর্ত্তের মধ্যে অপর অস্থির উন্নত কীলাকার অংশ প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে পারে, তাহাকে "চক্রকোর" * বলে। প্রথমা গ্রীবাকশেরুকার সহিত দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকার এইরূপে সন্ধি আছে সেই জন্য আমরা ঘাড় ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। (ঘ) যে সন্ধিতে সাঁড়াশির ন্যায় মুখ বিশিষ্ট অস্থির মধ্যে অপর অস্থির অংশ প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে পারে তাহাকে 'সন্দংশকোর' † বলে। কনুইয়ের সন্ধি এইরূপ।

উদূখল সন্ধি ‡—কোন অস্থির উদূখলের ন্যায় গভীর খাতমধ্যে অন্য অস্থির মুণ্ড প্রবিষ্ট হইয়া যে সন্ধি নির্ম্মিত হয় তাহাকে 'উদূখল সন্ধি' বলে। কক্ষ এবং বঙ্ক্ষণের সন্ধি এইরূপ। দন্ত সকলের অগ্রভাগ হনুস্থির গভীর খাতে প্রবিষ্ট বলিয়া ঐ সকল সন্ধিকেও উদূখল সন্ধি বলা যায়। কিন্তু ঐ সকল উদূখল সন্ধি অচল।

সামুদ্গ—দুই বা ততোধিক অস্থির দৃঢ়সংযোগে একটি সমুদ্গ বা সম্পুট (কৌটা বা বাটির মত) নির্ম্মিত হইলে সেই সন্ধিকে 'সামুদ্গ' বলা যায়। শ্রোণিতচক্র প্রভৃতিতে এইরূপ সন্ধি আছে। এই সকল সন্ধি অল্পচেষ্ট অর্থাৎ কম খেলে।

প্রতর §—দুইখানি অস্থির সমতল অংশ পাশাপাশি ভাবে বা উপর্য্যুপরি সংহিত হইলে তাহাকে 'প্রতরসন্ধি' বলে। চলপ্রতর যুক্তপ্রতর এবং দৃঢ়প্রতর ভেদে ইহা তিন প্রকার। তন্মধ্যে চলপ্রতর সন্ধির মধ্যে শ্লেষ্মাধরা কলার ব্যবধান থাকে। করপদের কূর্চ্চাস্থিসমূহের পরস্পরসন্ধি এইরূপ। দুইখানি অস্থি মধ্যস্থলে স্নায়ুরজ্জু বা দৃঢ় কলার দ্বারা সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'যুক্তপ্রতর' বলে। জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের মধ্যে ও প্রকোষ্ঠের

† ইং—Condyloid—কন্‌ডাইলয়েড্।
‡ ইং—Saddle—স্যাডল।

* ইং—Pivot Joint—পিভট্ জয়েণ্ট।
† ইং—Gyinglymus—গিংগ্লিমস্।
‡ ইং—Enarthrosis (Ball and socket joint) এনারথ্রোসিস্।
§ ইং—Arthrodia—আর্থ্রোডিয়া।

দুইখানি অস্থির মধ্যে এইরূপ সন্ধি আছে। সমজাতীয় অস্থিগুলি মধ্যবর্ত্তী তরুণাস্থি দ্বারা পরস্পর দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে তাহাকে দৃঢ়-প্রতর বলে। পৃষ্ঠবংশের কশেরুকাগুলি এইরূপে সন্ধিযুক্ত।

তুন্নসেবনী*—করাতের দাঁতের ন্যায় ধার বিশিষ্ট প্রান্তদ্বারা দুইখানি অস্থি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সেলাই করার ন্যায় দেখাইলে উক্ত সন্ধিকে 'তুন্নসেবনী' বলে। সীমন্তসেবনী এবং গ্রন্তসেবনী ভেদে ইহা দুই প্রকার দেখা যায়। তন্মধ্যে মস্তকের কপালাস্থি সমূহে 'সীমন্তসেবনী' এবং সীরিকা ও জতুকাস্থির সংযোগ স্থলে 'গ্রন্তসেবনী' সন্ধি আছে। যৌবনের পূর্ব্বে শ্রোণিফলকের তিনটী অংশের মধ্যে তুন্নসেবনী সন্ধি থাকে। আয়ুর্ব্বেদে সীমন্তসেবনী 'সীমন্ত' নামে অভিহিত।

বায়সতুণ্ড—কোন অস্থির কাকচঞ্চুবৎ অংশের মধ্যে অপর অস্থির অংশবিশেষ শিথিলভাবে সংহিত হইলে তাহাকে 'বায়সতুণ্ড' বলে। শঙ্খাস্থির সহিত অধোহনুর সন্ধি এইরূপ। এই সন্ধি এক প্রকার কোরসন্ধি হইলেও ইহা চেষ্টাবহুল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে।

মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত—শ্বাসপথের তরুণাস্থি সমূহে 'মণ্ডল' এবং কর্ণশষ্কুলীনির্ম্মাণকারী তরুণাস্থি সমূহে 'শঙ্খাবর্ত্ত' সন্ধি দেখা যায়। কিন্তু উহারা তরুণাস্থির সন্ধি বলিয়া পাশ্চাত্যগণ উহাদিগকে অস্থি-সন্ধি মধ্যে গণনা করেন না।

সচল সন্ধিসমূহে চারিটী পদার্থ বিশেষ দ্রষ্টব্য, যথা—অস্থির সন্ধেয় অংশ, সন্ধির মধ্যস্থিত তরুণাস্থি, স্নায়ু এবং শ্লেষ্মধরা কলা। তন্মধ্যে—

(১) অস্থির সন্ধের অংশ দৃঢ় ও চিক্কণ অস্থিময় এবং সন্ধান স্থলে সুমসৃণ তরুণাস্থি-পত্র দ্বারা আবৃত।

(২) সন্ধিস্থলে অবস্থিত তরুণাস্থি সকল দুই প্রকার—'সন্ধিবেষ্টক' এবং 'সন্ধ্যন্তরাল'। তন্মধ্যে সন্ধিবেষ্টক তরুণাস্থিগুলি অস্থির সন্ধেয় অংশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যন্তরালগুলি দুইখানি অস্থির সন্ধেয় অংশের মধ্যস্থলে পৃথক্ ভাবে থাকে।

(৩) স্নায়ুসমূহ তিন প্রকার—রজ্জুরূপ কোষরূপ, এবং কলারূপ। তন্মধ্যে রজ্জুরূপ স্নায়ুসকল সন্ধির মধ্যে ও চারিদিকে পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করে। কোষরূপ স্নায়ু সকল কোষের ন্যায় সমগ্র সন্ধিটীকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। অনেক পেশীর কণ্ডরা সন্ধি-সংযোজনী স্নায়ুর সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া যায়। কলারূপ স্নায়ু সকল কলা বা ঝিল্লীর ন্যায় দুইখানি অস্থির অন্তরালে বিস্তৃত থাকে, যথা—জঙ্ঘান্তরালা কলা।

পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চারিপ্রকার স্নায়ুর বিষয় বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রতানবতী স্নায়ুই অস্থির বন্ধন স্বরূপ বলিয়া এই অধ্যায়ে উহাদের বিষয়ই উল্লেখ করা যাইবে। অন্যান্য স্নায়ু পেশী ও আশয় বর্ণন প্রসঙ্গে বর্ণনীয়।

স্নায়ু শ্বেত ও পীত এই দুই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। তন্মধ্যে কশেরুকাচক্রের মধ্যবর্ত্তী স্নায়ুসমূহ ও গ্রীবাধরা স্নায়ু পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট। অন্যান্য স্থানের স্নায়ু শুভ্র।

* ইং—Schindylosis—শিন্‌ডিলোসিস্।

(৪) শ্লেষ্মধরা কলা*—সচল সন্ধি-সমূহের অস্থিদ্বয়ের মধ্যে এক একটী তরল পিচ্ছিল পদার্থ ('শ্লেষ্মক শ্লেষ্মা'†) পূর্ণ কলাময় কোষ থাকে। ঐ কোষের উভয় দিক্ অস্থিদ্বয়ের সন্ধেয় অংশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখে। শ্লেষ্মধরা কলা হইতে নিয়ত, 'শ্লেষ্মক' শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া সন্ধিস্থানকে আর্দ্র রাখে বলিয়া সন্ধিস্থান বেশ খেলিতে পারে এবং ঘর্ষিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

শ্লেষ্মধরা কলা তিনপ্রকার—সন্ধ্যন্তরীয়, কণ্ডরানুগা এবং ত্বকের নিম্নস্থ। সন্ধ্যন্তরীয় কলা অস্থিসন্ধির মধ্যে থাকে। কণ্ডরানুগা কলা চলনশীল কণ্ডরাসমূহকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ত্বঙ্নিম্নস্থ কলা কেবল ত্বকের দ্বারা আবৃত অস্থিসমূহের উপরে—অস্থি ও ত্বকের মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহাদের বিষয় পেশী ও অস্থিবর্ণনে দ্রষ্টব্য। সন্ধিপ্রসঙ্গে কেবল সন্ধ্যন্তরীয় কলার বিষয় বর্ণিত হইবে।

অচল সন্ধিসমূহে প্রয়োজনাভাব হেতু শ্লেষ্মধরা কলা থাকে না—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সন্ধিবর্ণনা।

সন্ধি সকলের স্থান, সংস্থান ও চেষ্টাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট সন্ধির প্রতীকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সন্ধিসমূহের বিষয় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। তজ্জন্য সংক্ষেপে সন্ধি সকলের বিষয় কথিত হইতেছে। উভয় দিকের অস্থির বা অস্থির অবয়বের সংযোজন করে বলিয়া সন্ধিবন্ধনী স্নায়ুগুলির নামও সেই অস্থিগুলির নামানুসারে কল্পিত হয়। কখন কখন কার্য্যানুসারেও সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে সকল স্থলে স্নায়ুগুলির নাম লেখা হইবে না।

মস্তকের সন্ধি।

বর্ণনার সুবিধার জন্য প্রথমে মস্তকের সন্ধি হইতে আরম্ভ করা যাইতেছে। শিরঃসন্ধির অন্যান্য অচল সন্ধিগুলির বিষয় সমগ্র করোটি বর্ণনকালে বলা হইয়াছে। এইস্থলে কেবল 'অধোহনুসন্ধান' 'শিরোগ্রীব সন্ধান' নামে দুইটী সন্ধির বিষয় বলা হইবে।

অধোহনুসন্ধান—অধোহনুর দুই মুণ্ড দুইটী শঙ্খাস্থির স্থালকদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সন্ধিদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া অধোহনু নীচে ও উপরের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে খেলিতে পারে। এই সন্ধিকে প্রাচীনেরা 'স্নায়সতুণ্ড' সন্ধি বলিয়াছেন। এই সন্ধিদ্বয়ের প্রত্যেকটী স্নায়ুকোষ দ্বারা আবৃত এবং বহিঃসীমায়, অন্তঃসীমায় ও পশ্চাতে এক একটী স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। সন্ধির উভয় দিকে দৃঢ়পেশী নিবেশ থাকিতেও এই সন্ধির দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়; কিন্তু পেশীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে এই সন্ধিদ্বয় সহজেই বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। হনুসন্ধির হঠাৎ বিশ্লেষ ঘটিলে মানুষ মুখ খুলিয়াই থাকে, মুখ বুজিতে পারে না।

শিরোগ্রীব সন্ধি—মস্তক ও পৃষ্ঠবংশের সন্ধিকে শিরোগ্রীবসন্ধি বলে। এই স্থানে তিনটী অস্থির মধ্যে পরস্পর সংযোগ হওয়ায় ত্রিবিধ সন্ধির সৃষ্টি হয়। যথা—

(ক) পশ্চিম কপাল ও চূড়াবলয়ার সন্ধি—পশ্চিমকপালের মূলকোটিদ্বয়ের সহিত কোরসন্ধি এবং অবশিষ্টাংশের প্রতরসন্ধি হয়। হয়। তন্মধ্যে কোরসন্ধিদ্বয় দুইটী স্নায়ুকোষে

* ইং—Synovial membrane—সাইনোভিয়াল মেম্ব্রেণ।

† ইং—Synovia—সাইনোভিয়া।

আচ্ছাদিত ও মধ্যে শ্লেষ্মধরা কলাযুক্ত। প্রতর-সন্ধিটী চারিদিকে চারিটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

(খ) চূড়াবলয়া ও দন্তচূড়ার সন্ধি—এই সন্ধিতে দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকা দন্তচূড়ার দন্তপ্রবর্দ্ধন নামক কীলবৎ অংশ চূড়াবলয়ার

[৪০শ চিত্র—শিরোগ্রীব সন্ধি (পৃষ্ঠতল)]

(পশ্চিম কপালের উপরের ও গ্রীবাকশেরুকাগুলির চক্রাংশ অপসারিত করিয়া দেখান হইয়াছে)

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

বিবর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার সম্মুখ-ভাগ বলয়ার্দ্ধের ভিতর দিকে সংসক্ত থাকে। এইরূপ সংযোগ থাকায় চূড়াবলয়াযুক্ত মস্তক পৃষ্ঠবংশের উপর সহজে ঘুরিতে ফিরিতে পারে। অতএব সম্মুখভাগে এইরূপ চক্রকোর সন্ধি এবং অবশিষ্ট অংশে প্রতরসন্ধি দেখা যায়। পাঁচটী স্নায়ু এই স্থানের সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে সম্মুখের স্নায়ু উভয় অস্থির কশেরুপিণ্ডের সম্মুখভাগ বন্ধন করিয়া রাখে। পশ্চাতের স্নায়ু দুই অস্থির কশেরু-চক্রের পশ্চাদ্‌ভাগ বন্ধন করিয়া থাকে। দুইটী স্নায়ুকোষ উভয় অস্থির দুই দিকের দুইটি সন্ধি প্রবর্দ্ধননক যুগলের সংযোজনা করে। 'স্বস্তিক-রজ্জু' স্নায়ু চওড়াদিকে চূড়াবলয়ার ভিতরের পরিধির উভয়দিকের কলায় বৎ অংশদ্বয়ে সংসক্ত এবং লম্বালম্বিভাবে উর্দ্ধ দিকে পশ্চাৎ কপালমূলের পিছনে মধ্যরেখায় ও অধোদিকে দন্তচূড়ার অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত। ইহা সম্মুখ হইতে দন্তপ্রবর্দ্ধনকে চূড়াবলয়ার ছিদ্র মধ্যে যথাস্থানে ধারণ করিয়া রাখে। দন্ত-প্রবর্দ্ধন স্থানচ্যুত হইলে সুষুম্নাশীর্ষ আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মনুষ্যকে ফাঁসি দিলে শ্বাসরোধের পূর্ব্বেই অনেক সময়ে এই কারণে মৃত্যু হইয়া থাকে।

(গ) পশ্চিম কপাল ও দন্তচূড়ার সন্ধি—এই দুইখানি অস্থির পরস্পর সংস্পর্শ না

থটিলেও সুষুম্নাবিবরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত চারিটী স্নায়ু দ্বারা ইহারা পরস্পর সংবদ্ধ থাকে।

শিরোগ্রীব সন্ধির এই সকল স্নায়ু ব্যতীত 'গ্রীবাধরা' নামে মহতী স্নায়ুরজ্জু পশ্চিম কপালের পশ্চিমার্ব্বুদ ও পশ্চিমালিকা হইতে সপ্তমী গ্রীবাকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই স্নায়ু স্থিতিস্থাপক এবং গ্রীবাকে ঋজুভাবে ধারণ করিয়া রাখে। মনুষ্যের মস্তক সোজা ভাবে থাকে বলিয়া মনুষ্যদেহে এই স্নায়ু তত পুষ্ট নহে। কিন্তু পশুর মস্তক আড়ভাবে থাকে বলিয়া তাহাদের মস্তক ধারণের জন্য এই স্নায়ু অত্যন্ত দৃঢ় ও স্থূল হইয়া থাকে।

মধ্য শরীরের সন্ধি।

পৃষ্ঠবংশসন্ধি—পৃষ্ঠবংশ উপর্য্যুপরি স্থাপিত কশেরুকা সমূহের দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যেক কশেরুকা উর্দ্ধস্থিত ও অধঃস্থিত অপর দুইটী কশেরুকার সহিত পাঁচটী করিয়া সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ। যথা—

(১) কশেরুকাপিণ্ডগুলির পরস্পর-সংযোজনী স্নায়ু। ইহারা তিনভাগে বিভক্ত।

(ক) কশেরুপুরঃস্থা সাধারণী, স্নায়ু দৃঢ়, স্থূল ও দীর্ঘ পট্টিকার (ফালির) মত। ইহা সমস্ত কশেরুকাপিণ্ডের সম্মুখ ভাগে সংসক্ত থাকিয়া সমগ্র পৃষ্ঠবংশের সাধারণ বন্ধন স্বরূপে অবস্থিত। (খ) 'কশেরুপশ্চিমা সাধারণী'—উপরোক্ত স্নায়ুর ন্যায় কশেরুকাসমূহের পশ্চাদ্ ভাগের সাধারণ বন্ধন স্বরূপ। (গ) 'কশেরুপিণ্ডান্তরালা' স্নায়ুগুলি কোমল, স্থিতিস্থাপক ও কশেরুপিণ্ডমধ্যস্থ তরুণাস্থি চক্রে সংসক্ত।

(২) কশেরুচক্রের পরস্পর সংযোজনী স্নায়ু সকল কশেরুচক্রগুলির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত, স্থিতিস্থাপক ও পীতবর্ণ। ইহারা 'কশেরুচক্রান্তরালা' নামে অভিহিত।

(৩) প্রত্যেক কশেরুকার দুইটী নিম্নাভিমুখ সন্ধিপ্রবর্দ্ধনের সহিত নিম্নস্থিত কশেরুকার ঊর্দ্ধাভিমুখ সন্ধিপ্রবর্দ্ধনদ্বয়ের সন্ধি হয়। ক্রমশঃ পরে পরে এইরূপ সন্ধি হইয়া থাকে। এই সন্ধিগুলি স্নায়ুকোষের দ্বারা আবৃত ও ভিতরে শ্লেষ্মধরা কলাযুক্ত।

(৪) পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সন্ধানকারক স্নায়ুসমূহ দুই প্রকার, তন্মধ্যে—

(ক) 'পৃষ্ঠকণ্টকধরা সাধারণী' স্নায়ু দৃঢ় রজ্জুর ন্যায় সমস্ত পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সংযোজন করে এবং পশ্চিম কপালের পৃষ্ঠস্থিত অর্ব্বুদ হইতে ত্রিকাস্থির পৃষ্ঠকণ্টক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ঊর্দ্ধ ভাগই 'গ্রীবাধরা' স্নায়ু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(খ) 'কণ্টকান্তরালা' স্নায়ু সকল পৃষ্ঠকণ্টকগুলির অন্তরালে অবস্থিত এবং পাতলা কলা দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল স্নায়ু পৃষ্ঠকশেরুকা ও কটিকশেরুকাগুলিতে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট দেখা যায়।

(৫) 'বাহুপ্রবর্দ্ধনান্তরালা' স্নায়ুগুলি বাহুপ্রবর্দ্ধন সকলের অন্তরালে থাকিয়া পরস্পরকে বন্ধন করে। উহারা গ্রীবাকশেরুকা ও কটিকশেরুকাগুলিতে পাতলা কলার আকারে এবং পৃষ্ঠকশেরুকা সমূহে রজ্জুর আকারে দৃষ্ট হয়।

কশেরুপিণ্ড সকলের পরস্পর সন্ধি প্রায় অচল। কশেরুচক্র সকলের পরস্পর সন্ধি অল্পচল। গ্রীবা ও কটিকশেরুকার সন্ধিগুলি

অপেক্ষাকৃত অধিক চল। পৃষ্ঠবংশের চেষ্টা বা চলত্ব তিনপ্রকার, যথা—সম্মুখে নমন বা অন্তরায়াম, পশ্চাতে নমন বা বহিরায়াম এবং উভয় পার্শ্বে নমন। পার্শ্ববিবর্ত্তন এই তিন প্রকার চেষ্টার মিশ্রণে হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠপর্শুকাসন্ধি—পর্শুকার সহিত পৃষ্ঠবংশের কশেরুকার সন্ধিকে পৃষ্ঠ-পর্শুকাসন্ধি বলে। এই সন্ধি দুই প্রকার যথা—

(১) পর্শুকামুণ্ডের সহিত কশেরুকা-পিণ্ডের চলপ্রতর জাতীয় সন্ধি। তন্মধ্যে প্রথমা, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী—এই পর্শুকাগুলির প্রত্যেকটী এক একটী কশেরু পিণ্ডের পূর্ণস্থালকের সহিত পৃথক্ ভাবে সংহিত হয়। অপরগুলির প্রত্যেকটী দুইটী কশেরুপিণ্ডের অর্দ্ধস্থালকদ্বয়ের সন্ধিযুক্ত হয়। ইহা প্রধানতঃ ত্রিশূলাকার স্নায়ু দ্বারা উপর নীচের কশেরুপিণ্ডদ্বয়ের ও তন্মধ্যস্থ তরুণাস্থি-চক্রের সহিত সম্বদ্ধ। এখানে পর্শুকামুণ্ডের বেষ্টনভূত একটী কোষাকার স্নায়ু ও তন্মধ্যে সন্ধ্যন্তরীয় স্নায়ুও থাকে।

(২) পর্শুকার্ব্বুদের সহিত কশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনের যুক্তপ্রতর সন্ধি। ইহা সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে রজ্জুবৎ স্নায়ু এবং মধ্যে কোষবৎ স্নায়ুদ্বারা প্রতিবদ্ধ।

পূর্ব্বপর্শুকাসন্ধি—পর্শুকা, উপপর্শুকা এবং উরঃফলকের সন্ধিসমূহ এই নামে খ্যাত। এই সন্ধি চারি প্রকার যথা—

(১) পর্শুকার সহিত উপপর্শুকার সন্ধি—বারখানি পর্শুকার অগ্রভাগস্থিত স্থালকের সহিত বারখানি উপপর্শুকার মূলের দৃঢ় ও অচল সন্ধি হইয়া থাকে।

(২) উপপর্শুকার সহিত উরঃফলকের সন্ধি—এক একদিকের প্রথম সাতখানি করিয়া উপপর্শুকার সহিত উরঃফলকের পার্শ্বস্থ স্থালকগুলির সন্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমা পর্শুকার সন্ধি অচল, অবশিষ্ট-গুলি যুক্তপ্রতর। অগ্রিমা, পশ্চিমা, কোষা-কারা এবং সন্ধ্যন্তরীয়া—এই চারি প্রকার স্নায়ু উপপর্শুকা ও উরঃফলকের সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে।

(৩) উপপর্শুকার পরস্পর সন্ধি—পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী উপপর্শুকার অগ্রভাগ-গুলি উরঃফলকে সংযুক্ত হইলেও উহাদের সম্মুখের কোণ উত্তরোত্তর পর্শুকার কোণের সহিত কতকগুলি স্নায়ুসূত্র দ্বারা সংবদ্ধ। অষ্টমী, নবমী ও দশমী উপপর্শুকার অগ্রভাগ কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপপর্শুকার কোণের সহিত ঐরূপে প্রতিবদ্ধ—উহাদের উরঃফলকের সহিত সন্ধি নাই। একাদশী ও দ্বাদশী উপপর্শুকার অগ্রভাগ বিমুক্ত—অর্থাৎ কাহারও সহিত সন্ধিযুক্ত নহে।

(৪) উরঃফলকের খণ্ডগুলির পরস্পর সন্ধি—অল্প বয়সে উরঃফলকের গ্রৈবেয়ক, মধ্যফলক এবং অগ্রপত্র নামক খণ্ডত্রয় পরস্পর সন্ধিযুক্ত ও স্নায়ু দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। প্রৌঢ় বয়সে এই খণ্ডত্রয় জুড়িয়া যায়।

অক্ষকোরঃ সন্ধান—উরঃ-ফলকের ঊর্দ্ধাংশের দুইপার্শ্বে দুইখানি অক্ষ-কাস্থির প্রান্তভাগ স্নায়ুকোষ দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। এই সন্ধি দৃঢ় করিবার জন্য অক্ষ-কাস্থি প্রথমা পর্শুকার সহিত ও স্নায়ু দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অক্ষকাস্থিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ সন্ধি না থাকিলেও এক স্নায়ু উরঃ-

ফলকের শিখরদেশের উপর দিয়া উহাদের সম্মুখ প্রান্তদ্বয়কে সংবদ্ধ করিয়া রাখে। অংসসন্ধি বর্ণন প্রসঙ্গে অক্ষকাস্থির সহিত অংসের সন্ধানের বিষয় বলা যাইবে।

শ্রোণিচক্রসন্ধি — শ্রোণিচক্র-সন্ধি দুই ভাগে বর্ণনীয়। শ্রোণিফলকদ্বয়ের পৃষ্ঠবংশের সহিত সন্ধি এবং পরস্পরের সন্ধি। শ্রোণিফলকদ্বয়ের সহিত পৃষ্ঠবংশের দৃঢ়প্রতর সন্ধি হয়। ইহা পঞ্চমী কটিকশেরুকার সহিত ত্রিকাস্থির সন্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে। পৃষ্ঠ-বংশের সন্ধারণী যে পাঁচ প্রকার স্নায়ুর বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই পাঁচ প্রকার স্নায়ু দ্বারাই এই স্থলেরও সন্ধিবন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কেবল এক এক দিকে দুইটী করিয়া স্নায়ু বেশী থাকে। যথা—

[৪১শ চিত্র—শ্রোণিচক্র সন্ধি]

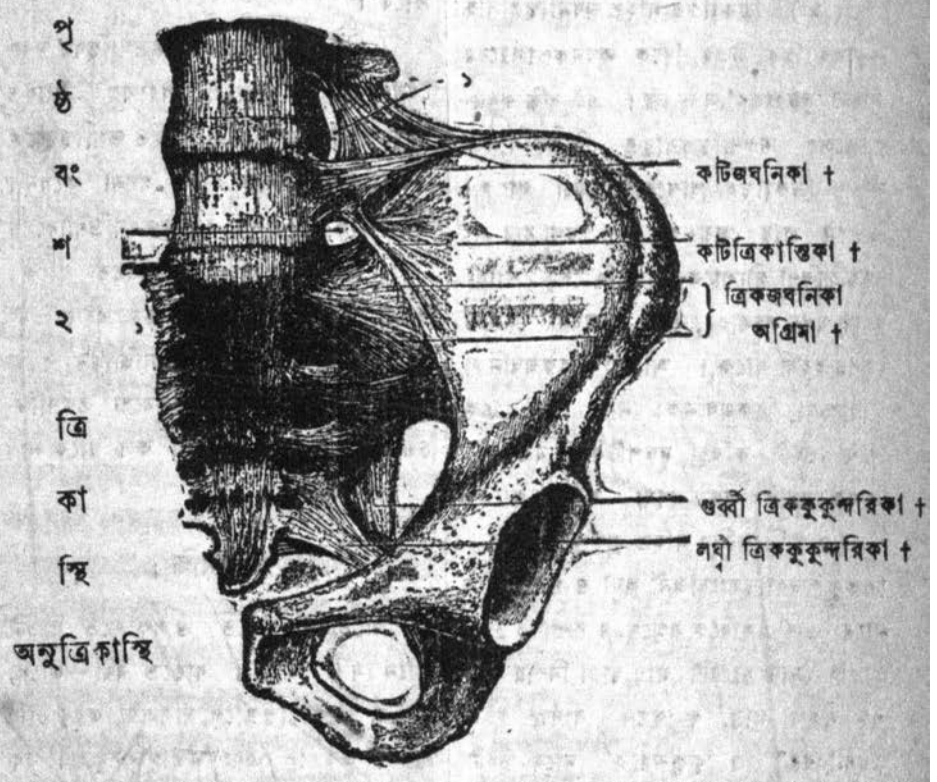

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক। ১,২ কটিনাড়ী নির্গমের বিবরদ্বয়। এই চিত্রের বামার্দ্ধে যেরূপ স্নায়ু দেখান হইয়াছে দক্ষিণার্দ্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।]

'কটিজঘনিকা' নামে দুইটী স্নায়ু চতুর্থী ও পঞ্চমী কটিকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনকগুলির সহিত উভয়দিকে জঘনধারার পশ্চিম প্রান্তভাগকে সংবদ্ধ করে। 'কটিত্রিকাস্থিকা' স্নায়ু দৃঢ় ও ত্রিকোণ ফালির ন্যায়, ইহা পঞ্চমী কটিকশেরুকাকে ত্রিকাস্থির ও শ্রোণিফলকের ত্রিক স্থালকের পরিধির সহিত সংবদ্ধ করে।

শ্রোণিচক্রাস্থিত্রয়ের পরস্পর সন্ধি চারি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়, যথা—

(১) ত্রিকাস্থির সহিত জঘনাস্থির সন্ধি—ত্রিকাস্থির উভয় দিকে জঘনকপালদ্বয়ের সহিত 'দৃঢ়প্রতর' সন্ধি হয়। এই সন্ধি জঘনকপালের তরুণাস্থিপত্রাবৃত ত্রিকস্থালকের সহিত ত্রিকাস্থির পার্শ্বদেশে হইয়া থাকে। এখানে প্রায় শ্লেষ্মধরা কলা দেখা যায় না, কিন্তু গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভবৃদ্ধি হেতু শ্রোণিফলক যখন সচল হয়, তখন শ্লেষ্মধরা কলাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অগ্রিমা ত্রিকজঘনিকা ও পশ্চিমা ত্রিকজঘনিকা নামে এক এক দিকে দুইটী করিয়া দৃঢ়পট্টিকার মত স্নায়ু ত্রিকজঘনসন্ধির বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে।

(২) ত্রিকাস্থির সহিত কুকুন্দরের সন্ধি—ত্রিককুকুন্দরাস্থিসংযোজনী লঘ্বী ও গুর্ব্বী নামে নামে এক একদিকে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি করিয়া মোট চারিটী স্নায়ু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই সকল স্নায়ু যথাস্থানে সংসক্ত হইয়া গৃধ্রসীবিবর* ও 'কুকুন্দদ্বার' নামে দুইটী বিবর নির্ম্মাণ করে। তন্মধ্যে গৃধ্রসী নাড়ী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও গুহ্যকাখ্য পেশী নির্গত হইয়া থাকে। আর কুকুন্দরবিবরের ভিতর দিয়া 'শ্রোণিগবাক্ষণী' পেশী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও নাড়ী বস্তিগুহায় প্রবেশ করিয়া থাকে।

(৩) ত্রিকানুত্রিকসন্ধি—অগ্রিমা, পশ্চিমা এবং দুইটী পার্শ্বগা—এই চারিটী স্নায়ু ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থির সন্ধি বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুত্রিকাস্থি চারিখানি ক্ষুদ্র কশেরুকাখণ্ডের সংযোগে নির্ম্মিত, কিন্তু প্রসবকালে শ্রোণিদ্বারের বিস্তারের সুবিধার জন্য নারীদিগের দেহে স্বভাবতঃ ঐ খণ্ড চতুষ্টয় পৃথক্ ভাবে থাকে।

(৪) ভগাস্থিদ্বয়ের সন্ধিভগাস্থিদ্বয় মধ্যরেখায় স্ব স্ব মুণ্ডদ্বারা পরস্পর সংহিত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা সংহিত ভগাস্থিদ্বয়কে একখানি পৃথক্ অস্থি বলিয়া গণনা করেন। এই সন্ধি দৃঢ়প্রতর হইলেও গর্ভিণীদিগের দেহে কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইতে পারে। উত্তরা, অধরা, অগ্রিমা ও পশ্চিমা এই চারিটী 'ভগ-সংযোজনী' স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। উক্ত সন্ধিমধ্যে তরুণাস্থিচক্র থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মাধরা কলা থাকে না।

শাখাসন্ধি।

প্রত্যেক বাহুতে ও সক্থিতে সাতটী স্থানে সন্ধি আছে। বাহুতে যথা—অংসে, কূর্পরে, প্রকোষ্ঠান্তরালে, মণিবন্ধে, করকূর্চ্চাস্থিগুলির করতলে এবং করাঙ্গুলিসমূহে। সক্থিতে যথা—বংক্ষণে, জানুতে, জঙ্ঘান্তরালে, পদসন্ধিতে, পাদকূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে, পদতলে এবং পদাঙ্গুলি সমূহে। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্ লিখিত হইতেছে।

ঊর্দ্ধশাখাসন্ধি।

অংসসন্ধি—অক্ষক, অংসফলক ও প্রগণ্ডাস্থি—এই তিনটী অস্থির যোগে এই সন্ধি নির্ম্মিত। অক্ষক ও অংসফলকের সন্ধিকে অংসচক্র সন্ধান এবং প্রগণ্ড ও অংস ফলকের সন্ধানকে অংসোদূখল সন্ধি বা কক্ষা-সন্ধি বলে।

অংসচক্র সন্ধান—অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্ত এবং অংস কূটাগ্রের সংযোগে এই 'চলপ্রতর' সন্ধিটী নির্ম্মিত হয়। এই সন্ধিবন্ধনী চারিটী স্নায়ুর মধ্যে 'অংসাক্ষকবন্ধনী' উত্তরা ও অধরা নামে দুইটী ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে অংস এবং অক্ষকাস্থির বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। 'তুণ্ডা-ক্ষকবন্ধনী' ত্রিকোণিকা ও চতুরস্রিকা নামে দুইটী স্নায়ু অংসতুণ্ডের পশ্চার্দ্ধের সহিত অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্তের ঊর্দ্ধাধস্তলকে সংবদ্ধ করিয়া থাকে। অংসফলকের তুণ্ড ও কূট নামক অবয়বদ্বয়ের মধ্যে 'তুণ্ডমূলিকা' নামে দুইটি স্নায়ু আছে।

অংসোদূখলক সন্ধি বা কক্ষাসন্ধি—অংস পীঠের নাতিগভীর উদূখলাকার স্থালকটি পরিধিতে তরুণাস্থিচক্রের সংযোগে গভীর কোটরাকার হয়। উহার মধ্যে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড সংসক্ত হইয়া এই সন্ধি নির্ম্মিত হয়। দুইটী স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটী 'অংসোদূখলিক' নামক দীর্ঘ শিথিল স্নায়ুকোষ। ইহা ঊর্দ্ধে অংসোদূখলের চারিদিকে এবং নিম্নে প্রগণ্ডাস্থির গ্রীবা বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ইহার মধ্যে বৃহৎ শ্লেষ্মধরা কলা বর্ত্তমান। স্নায়ুকোষের তিনটী ছিদ্র দিয়া এই কলার তিনটি কণ্ডরানুগা শাখা বাহির হইয়া কণ্ডরাগুলির ক্রিয়ার সহায়তা করে। কণ্ডরাগুলি 'অংসান্তরিকা' অধরা, 'অংসপৃষ্ঠিকা' এবং 'দ্বিশিরস্কা' পেশীর দীর্ঘশিখা নামে প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত কণ্ডরাটী সন্ধির ভিতর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। দ্বিতীয় স্নায়ুটী 'তুণ্ডপ্রগণ্ডিকা' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অংস-তুণ্ড এবং প্রগণ্ডাস্থির মহাপিণ্ডের সংযোজন করে এবং স্নায়ুকোষের গাত্রে প্রতিবদ্ধ।

পেশী—নিম্নলিখিত পেশীগুলি অংস-সন্ধিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত যথা—ঊর্দ্ধে উত্তরা অংসপৃষ্ঠিকা, নিম্নে ত্রিশিরস্কাপেশীর দীর্ঘশিখা, অন্তঃপার্শ্বে অংসান্তরিকা, বহিঃ-পার্শ্বে অধরা অংসপৃষ্ঠিকা ও লঘ্বী অংসাধারিকা, স্নায়ুকোষের অভ্যন্তরে দ্বিশিরস্কা পেশীর দীর্ঘ-শিখা এবং সমগ্র অংসসন্ধি ও অংসচক্র আচ্ছা-দন করিল অংসচ্ছদা।

চেষ্টা—এই সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া সম্মুখ, পশ্চাৎ, ভিতর ও বাহির দিকে নানা প্রকার আকর্ষণাদি চেষ্টা হইয়া থাকে। এই সন্ধিতে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড যথেষ্ট বিবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহাকে সমস্ত সচল সন্ধির প্রধান বলা যায়।

কূর্পর সন্ধি—প্রগণ্ডাস্থির অধঃ-প্রান্ত এবং প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধপ্রান্ত সংযোগে এই সন্ধি নির্ম্মিত হয়। অন্তঃ-প্রকোষ্ঠাস্থির সন্দংশাকার কূটদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রগণ্ডাস্থির ডমরুবৎ অংশ সংহিত বলিয়া ইহাকে 'সন্দংশকোর' সন্ধি বলে। বহিঃ-প্রকোষ্ঠাস্থির কোরমধ্য মুণ্ডও এই স্থানে প্রগণ্ডাস্থির কন্দলীর সহিত সংহিত হইয়া থাকে এবং উক্ত মুণ্ডের পার্শ্বদেশ এই সন্ধির মধ্যেই 'মুণ্ডবেষ্টনিকা' স্নায়ু দ্বারা অন্তঃপ্রকো-ষ্ঠির পার্শ্বে সংহিত হয়।

[৪৩শ চিত্র—কূর্পর সন্ধি (আন্তর তল)

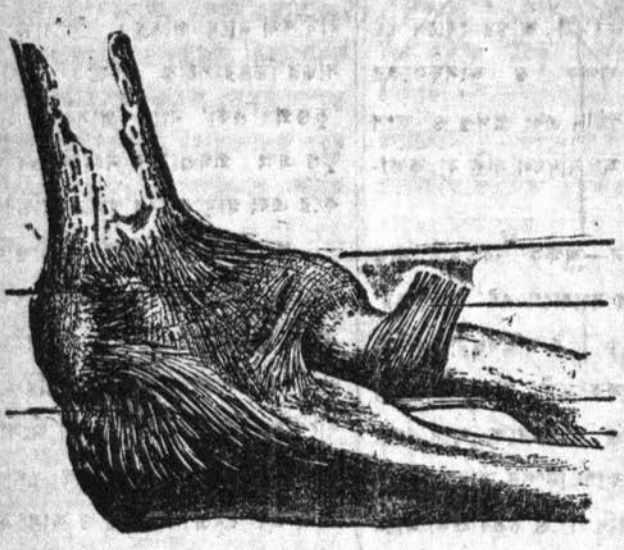

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

কূর্পরসন্ধিবন্ধনী স্নায়ু চারিটী—অগ্রিমা, পশ্চিমা, বহিঃপার্শ্বিকা ও অন্তঃপার্শ্বিকা। তন্মধ্যে—

অগ্রিমা বা সম্মুখস্থ স্নায়ুর এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির অন্তরর্ব্বুদের সম্মুখতলে সম্বদ্ধ এবং অপর প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চঞ্চুপ্রবর্দ্ধনের পরিধিতে ও মুণ্ডবেষ্টনিকা স্নায়ুর সহিত সম্বদ্ধ। পশ্চিমা স্নায়ুর এক প্রান্ত কূর্পরখাতের উপকণ্ঠে এবং অন্য প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূর্পরকূটের পরিধির সহিত সংসক্ত। বহিঃপার্শ্বিকার এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির বাহ্যর্ব্বুদে এবং অন্য প্রান্ত মুণ্ডবেষ্টনিকা স্নায়ুর সহিত সংসক্ত। অন্তঃপার্শ্বিকা স্নায়ুর এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির অন্তরর্ব্বুদে এবং অন্য প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূটদ্বয়ের পরিধির অন্তঃসীমায় সংসক্ত।

চেষ্টা—কূর্পরসন্ধির চেষ্টা চারি প্রকার—সঙ্কোচ, প্রসার, অন্তর্ব্বিবর্ত্তন ও বহির্ব্বিবর্ত্তন। তন্মধ্যে—প্রসার দ্বারা বাহু দণ্ডবৎ হইতে পারে, বিপরীত দিকে নত হয় না।

শ্লেষ্মধরা কলা—এই সন্ধির মধ্যস্থিত শ্লেষ্মধরা কলার শাখা প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

প্রকোষ্ঠান্তরীয় সন্ধি—প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রান্তে কোর-সন্ধি এবং মধ্যস্থলে প্রতর সন্ধি হইয়া থাকে। এই সকল সন্ধি অনচল। ঊর্দ্ধপ্রান্তে বহিঃ-

প্রকোষ্ঠাস্থির মুণ্ড অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চক্র-নেমিখণ্ডে সংহিত হয় এবং বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মুণ্ডের বিবর্ত্তনপ্রদ 'মুণ্ডবেষ্টনিকা' স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। 'প্রকোষ্ঠা-তিরশ্চনা' নামে অপর একটী স্নায়ুও এই স্থানের অধোদেশের বন্ধনস্বরূপে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের নিম্নপ্রান্তে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মণিমুণ্ড বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তের পার্শ্বে সংহিত হইয়া থাকে। সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটী স্নায়ু এবং মণিবন্ধ-সন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট ত্রিকোণ তরুণাস্থি দ্বারা এই সন্ধির বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। মধ্য-নলকদ্বয়ের সন্ধানে অস্থিদ্বয়ের পরস্পর সংস্পর্শ হয় না, পরন্তু 'প্রকোষ্ঠান্তরালা' নামে দৃঢ় কলা দ্বারা ইহারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যেরূপ দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালা-দেশে মৃত্যু সংখ্যা যেরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে তাহা ভাবিবার কথা। এক সময়ে বাঙ্গলার অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন-কার বাঙ্গালী এখনকার অপেক্ষা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন কি না—সে বিচার আমরা করিব না, তবে তখন অপেক্ষা এখনকার বাঙ্গালী হয় তো অনেক বিষয়ে পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের পন্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যে—তথা পরমায়ু লাভ বিষয়ে এখনকার বাঙ্গালী যে সেকালের বাঙ্গালীর অনেক নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।

তখনকার বাঙ্গালীর সকলেই লেখাপড়া শিখিত না, তাহার কারণ সেকালে চাকরি দ্বারা অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহের কল্পনা এখনকার মত বাঙ্গালী মাত্রেই প্রথম হইতে করিয়া রাখিতেন না। সেকালের গোয়ালা-বাঙ্গালী জানিত—দুগ্ধ বিক্রয়ের অর্থেই তাহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, মালাকর জাতীয় বাঙ্গালী জানিত—পূজা-পার্ব্বণে দেবীপ্রতিমার সজ্জা বিন্যাসে—তথা বরবধূর মিলন জনিত কতক-গুলি কার্য্যে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। বাঙ্গালী-তিলি জানিত কিছু না করিতে পারিলে সে মুদিখানার দোকান করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবে। বাঙ্গালী-তন্তুবায় সকল বাঙ্গালীর বস্ত্র যোগাইত, কাজেই তাহাকে অন্য উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের চিন্তা করিতে হইত না। বাঙ্গালী-ময়রা মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরিত। বারুইজাতীয় বাঙ্গালী সকলকে তাম্বুল যোগাইত, কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করিত, কর্ম্মকার—বাঙ্গালীর প্রয়োজনীয় কুঠারাদি অস্ত্র প্রস্তুত করিত, নাপিত ক্ষৌরকার্য্য করিত;—কাজেই বাঙ্গালীর নবশাক জাতীয়ের মনে সেকালে চাকরি করিবার

কল্পনা আদৌ উপস্থিত হইত না। সেকালের নবশাক জাতীয় বাঙ্গালীর এইজন্য লেখাপড়া শিখিবার আবশ্যকও হইত না।

সেকালে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত লেখাপড়া শিখিত ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যগণ। বাঙ্গালী কায়স্থও লেখাপড়া শিখিত বটে, কিন্তু সে বিদ্যার পরিসমাপ্তি প্রায়ই শিশুবোধক এবং শুভঙ্করী পাঠেই হইয়া যাইত, কেহ কেহ একটু আরবী, একটু পারসী একটু উর্দ্দু শিক্ষা করিতেন, তাহার ফলে নবাব সরকারে চাকরির একটু সুবিধা হইত। ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যজাতির বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইতেন, কিন্তু তাহা চাকরি করিবার উদ্দেশ্যে নহে। ব্রাহ্মণেরা 'টোল' খুলিয়া অধীত বিদ্যার অধ্যাপনায় আরও বিদ্যালাভের পন্থা পরিষ্কার করিতেন, বৈদ্য চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রশিক্ষার ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণেরই মত জ্ঞানার্জ্জনের উপায় করিতেন।

এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন বাঙ্গালীর সকল জাতিই পণ্ডিত হউক না হউক—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের জন্য ব্যগ্র হইতেছে। উদ্দেশ্য—সহজে চাকরিপ্রাপ্তির উপায় বিধান। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের জন্য বাঙ্গালীর কোমলমতি শিশুদিগের স্বাস্থ্য প্রথম হইতেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহার পর চাকরি জীবনে সে স্বাস্থ্যের অপচয় এরূপ হইয়া পড়িতেছে যে, বাঙ্গালীর অকর্ম্মণ্যতা একান্তই অবশ্যম্ভাবী।

এখনকার দিনে অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু এই অজীর্ণপ্রবণতার কারণ কি? বাঙ্গালী ছেলের অনেকেই অভিভাবক শূন্য অবস্থায় মেসে-বোর্ডিংয়ে অবস্থিতি করে, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধি সকল তাহাদিগকে কেহ শিখাইয়া দেয় না। অধিক জলপান বিষম ভোজন (অল্প ভোজন, বহু ভোজন বা বা অসময়ে ভোজন) মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ—এই সকল কারণে যে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়—এ সব কথা তাহাদিগকে কেহ বলিয়া দেয় না। বলিয়া দিলেও ঘটনাচক্রে সে সকল পালন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইয়া উঠে না। মাতাভগ্নী পরিত্যক্ত অল্পমতি শিশুগণ ফিজিক্স-কেমিষ্ট্রির তত্ত্ব সকল অবগত হইতে গিয়া যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কলিকাতার মত স্থানে সহজসুলভ-চায়ের লোভ সম্বরণ অথবা সোডা-লেমোনেড-সরবতের পিপাসা পূর্ণ না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। ফলে অজীর্ণের প্রধান কারণ অধিক জলপান এইরূপ ভাবে ছাত্র জীবনেই অনেকের নিকট অভ্যস্ত হয় এবং কালে কর্ম্মময় জীবনেও অভ্যাস দোষে অনেকে সে দোষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহার পর অল্প ভোজন,—বহু ভোজন—ইহাও ছাত্রজীবনে অপরিহার্য্য। এখানে অল্প ভোজন অর্থে ধরিয়া লইতে হইবে—বাঙ্গালী বালককে যে পরিমাণ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়, মেসে-বোর্ডিংয়ে থাকিয়া সে পরিমাণ আহার্য্যলাভ প্রায়শঃই তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আর রাত্রি জাগরণ—সে তো ডিগ্রি লাভের কামনায় না করিলে উপায় নাই। ফলে নানা কারণে অজীর্ণের বীজ বাঙ্গালী

শিশুর প্রাথমিক জীবনেই যাহা অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে—কালে কর্ম্মময় জীবনে তাহাই বাঙ্গালীর আয়ুক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ হইয়া উঠিতেছে। অনেক বাঙ্গালীই অজীর্ণপ্রবণ হইতেছে এই কারণে।

বহুকাল চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এই অজীর্ণই হইতেছে বাঙ্গালী জাতীর আয়ুক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ। আমরা ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়া কাজ নাই—এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু যেরূপ ভাবে তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহার পরিবর্ত্তন করা যে উচিত—একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব। আমরা এখনকার দিনে ছেলেরা কেবল নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেছে কিনা তাহাই দেখি—কিন্তু তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে কিনা তাহার চিন্তা তো মোটেই করিনা। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা আছে—এ কথাটা এখনকার অনেক পিতামাতারই জ্ঞান নাই। বিদ্যালয় সমূহে অবশ্য সে ব্যায়ামের ব্যবস্থা অল্পবিস্তর প্রবর্ত্তিত আছে, কিন্তু সে ব্যায়ামের কাল যে সময়ে নির্দ্দিষ্ট—তাহা কখনই বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে উপযুক্ত নহে। বাঙ্গালী বালকদিগকে যে সকল ব্যায়াম করান হয়, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তাহাও বাঙ্গালীশিশুর পক্ষে প্রকৃষ্ট নহে। সেকালে ছেলেদের ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল—হেঁড়েডুডু, কপাটিখেলা প্রভৃতি। একালের ব্যায়াম হইয়াছে, ব্যাটবল, ফুটবল প্রভৃতি। এ সকল ব্যায়ামের ব্যবস্থা ইংরাজ জাতির নিকট আমরা শিক্ষা করিয়াছি। ইংরাজ স্বভাবতঃ মাংসাশী জাতি। মাংসাশী জাতির পক্ষে ঐরূপ ব্যায়াম যেরূপ ফলোপদায়ক হয়, শাকান্নভোজী বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে তাহা কখনই উপযুক্ত নহে, কাজেই ঐ ধরণের ব্যায়াম চর্চ্চায় অনেক স্থলে বাঙ্গালীবালক যশস্বী হইলেও তাহা যে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে তাহা সুনিশ্চয়।

সেকালে বাঙ্গালীশিশুর লেখাপড়ার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল—প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে। বাঙ্গালীর কর্ম্মকালও নির্দ্দিষ্ট ছিল ঐ দুইটী সময়। দ্বিপ্রহরে সকলেই বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেন, এখন দেশ হইতে সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ফলে আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতেই বাঙ্গালী শিশুকে জ্যামিতি-বীজগণিতের তত্ত্ব অন্বেষণে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে হয়—বাঙ্গালী কর্ম্মীর পক্ষেও ঐ ব্যবস্থা। বাঙ্গালীর আয়ুক্ষয়ের ইহাও কারণ। তাহার পর ব্রহ্মচর্য্যের কথা। ব্রহ্মচর্য্যপালন বাঙ্গালী বালক তো এখনকায় দিনে করিতেই জানেনা,—সে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানের স্পৃহাও কাহারও নাই। সেকালে বাঙ্গালী বালকের অধ্যয়নকাল যতদিন পূর্ণ না হইত—ততদিন তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইত। সেকালের গুরুগৃহের অধ্যয়নের ব্যবস্থা ইহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন সে গুরুও নাই, সে ছাত্রও নাই। ফলে ব্রহ্মচর্য্যহীনতাই যে এখনকার দিনে আমাদের আয়ুক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ এবং কলিকাতায় যক্ষ্মা বৃদ্ধি যে তাহারই ফলসম্ভূত, তাহা প্রত্যেক অভিভাবকই চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। আমরা সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব।

পদ্ম।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

পদ্ম—পদ্ম ত্রিবিধ, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম রক্তপদ্ম। নীলপদ্ম এখন এতদ্দেশে দৃষ্ট হয় না। পুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধেচ্ছু হইয়া মহামায়া ভগবতীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য এক লক্ষ নীলপদ্ম দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী অপহৃত হওয়ায় পূজার বিঘ্নোৎপন্ন হয়, পরম ভক্ত রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সংকল্পিত পদ্মের সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য নিজের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া পূজা সমাপনের বাসনা করিলে, মহামায়া মহাশক্তি ভক্তের বাসনা পূর্ণার্থে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাবণবধের বরদান করিয়াছিলেন। এই পুরাণোক্ত বর্ণিত বিষয়ে নীলপদ্মের সংজ্ঞা অবগত হওয়া যায়। উহা না কি রামভক্ত হনুমান কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল।

রক্তপদ্ম ও শ্বেতপদ্ম এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাঢ়দেশেই শ্বেতপদ্মের উৎপত্তি অধিক দৃষ্ট হয়।

পদ্মের মূল, মৃণাল, পত্র ও পুষ্প সমস্তই বিভিন্ন প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে পদ্মের গুণ প্রকাশ করিতেছি—

রক্তপিত্তরোগে পদ্ম—পদ্ম বা মৃণালের স্বরস, কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগীর রক্তবমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে মৃণালের কল্ক কাথও রক্তপিত্তে হিতকর।

মূত্রকৃচ্ছ্রে পদ্ম—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীকে পদ্মের মৃণাল ও উৎপলের কাথ সেবন করাইলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

রক্তার্শে পদ্মকেশর—পদ্মের কেশর চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাখন ও ইক্ষুর চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের রক্তরোধ হইয়া থাকে।

জ্বরাতিসারে পদ্মকেশর—জ্বরাতিসার রোগে, পদ্মকেশর, উৎপল ও দাড়িমের খোসা—সমভাগে লইয়া চাউল ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে জ্বরাতিসার উপশমিত হয়।

রক্তবমনে পদ্মকেশর—রক্তবমন হইলে পদ্মকেশর কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়।

মূত্ররোধে পদ্মকন্দ—মূত্র রোধ হইলে পদ্মকন্দ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধপীড়ার উপশম হয়। পদ্মকন্দ প্রথমতঃ তিল তৈলে ভাজিয়া লইবে, তৎপর গোমূত্রে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

পদ্মবীজ—শ্বেত ও রক্তপ্রদরে চাউল ধৌত জলসহ পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দাহসংযুক্ত জ্বরে পদ্মপত্রে শয়ন করিলে দাহ উপশম হয়।

পদ্মের সিরাপ—অর্শের রক্তস্রাব ও রক্তপ্রদরের স্রাবে বিশেষ উপকারী।

পদ্মের কোমল পত্রপুষ্প শ্বেতচন্দন ও আমলকী পেষণ করিয়া জ্বরকালীন শিরঃপীড়ায় কপালে প্রলেপ দিলে বিশেষ শান্তি বোধ হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়ায় মুষ্টিযোগ।

(কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন)

১। কিসমিস, গুলঞ্চ, বাসকছাল, চিরাতা, দারুহরিদ্রা, আমলকী—প্রত্যেক দ্রব্য ।৶১০ জল ৶৷৷০ সের শেষ ৶০ এই কাথ সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

২। অনন্তমূল, যষ্টীমধু, জাঙ্গীহরীতকী ও পিঁপুল—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমানভাগে ১ তোলা লইয়া আমলকীর কাথে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে এক আনা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রে একটি করিয়া বটীকা সিউলী পাতার রস ও মধুসহ সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৩। সিউলী পাতা, বেলপাতা, গুলঞ্চ ক্ষেৎপাপড়া—ইহাদের স্বরস ৶০ ছটাক পরিমাণ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণসহ পান করিলে ম্যালেরিয়ার উপশম হয়।

৪। মনসাপাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া তাহার রস অর্দ্ধছটাক ৩।৪ রতি পিঁপুল চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চ ও অনন্তমূল প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা, জল ৶৷৷০ সের শেষ ৶০ পোয়া—ইহাতে চারি আনা পরিমাণ সোঁদালের আটা গুলিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে ৩ সপ্তাহের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

৬। বামনহাটী চূর্ণ করতঃ এক আনা প্রাতে ও এক আনা সন্ধ্যায়—২ তোলা পরিমাণ ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধুর সহিত সেবনে ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়।

৭। নিমপাতা, চিরাতা, গুলঞ্চ, সোঁদালের আটা—প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ তোলা জল ৶৷৷০ সের, শেষ ৶০,—ইহা কয়েক দিন পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

৮। তুলসীর পাতার রস ১ তোলা ও বেলপাতার রস ১ তোলা—কিঞ্চিৎ মধুসহ প্রত্যহ পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর উপশমিত হয়।

৯। হিঙ্গু অর্দ্ধ রতি, পিঁপুলচূর্ণ ৩ রতি—২ তোলা গুলঞ্চের রসের সহিত প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে প্রবল কম্পযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র বিদূরীত হয়।

১০। রসসিন্দুর ৶০ আনা, সোডা ১।০ সওয়া রতি—একত্র গ্রহণকরতঃ নিসিন্দা পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৩টি বটি প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা প্রাতে ১টি মধ্যাহ্নে ১টি ও বিকালে ১টি জলসহ সেবন করিলে জ্বর ৩ দিনের মধ্যে ছাড়িয়া যায়।

১১। কণকধুতরার মূল অর্দ্ধ রতি সন্ধ্যাকালে ছেঁচিয়া একছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে উক্ত ঔষধ না ঝাকাইয়া মূলটি তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নির্ম্মল জলটুকু পান করিয়াই সর্ষপতৈল মর্দ্দন করতঃ অবগাহন করিবে। স্নানের পর মিছরির সরবৎ খাইবে। জল ৶৷৷০ সের ও মিছরি ৶।০ ভিজাইয়া প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঝালের ঝোল ও ভাত খাইবে। এই ঔষধ ১ দিন মাত্র সেব্য। কিন্তু সরবত ১ সপ্তাহ খাইবে। ইহা জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বরে প্রত্যক্ষ ফলদায়ক।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

জীর্ণ জটিল রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যেরূপ ফলপ্রদ এমন আর কোনো চিকিৎসা নহে। ম্যালেরিয়া জ্বরে এল্যাপাথিক চিকিৎসকেরা কুইনাইন-সাহায্যে যে চিকিৎসা করেন, তাহাতে কিন্তু পুনঃ পুনঃ পালটাইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ মতে যদি পাচন ও বটিকা প্রভৃতির প্রয়োগে ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে তাহার যে আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না ইহা ধ্রুব সত্য। সুখের বিষয় এখন দেশের লোকে এ কথা বুঝিতেছেন এবং তাহার ফলে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ময়মনসিংহের চারুমিহির আমাদিগকে সংবাদ দিতেছেন—

অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ডাক্তারি চিকিৎসায় ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন, কিন্তু ভাল কবিরাজী চিকিৎসায় উত্তম ফল পাওয়া যাইয়া থাকে। টাঙ্গাইল উপবিভাগ ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগবাহুল্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। টাঙ্গাইলের বহু অধিবাসী টাঙ্গাইলের একটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন জন্য ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ডিঃ বোর্ডের স্বাস্থ্যকমিটি গত ১৩ মে তারিখে এই বিষয়ে টাঙ্গাইলের সবডিবিসনাল অফিসারকে সবিস্তার রিপোর্ট করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক কি পরিমাণ ব্যয় পড়িবার সম্ভাবনা, কি প্রকার শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক, ছাত্রসংখ্যা কি পরিমাণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ময়মনসিংহের অবস্থা যেরূপ ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও চারুমিহিরের নিম্নলিখিত সংবাদটীতে উপলব্ধি হইয়া থাকে,—

নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্তর্গত বহুগ্রামে ভীষণ জ্বরের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক ইতিমধ্যেই জ্বরে মারা গিয়াছে। বহু পরিবারে শুশ্রূষা করিবার বা পথ্যাদি দিবার লোক পর্য্যন্ত নাই। ডিঃ বোর্ড কোনও কোনও স্থানে ডাক্তার পাঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বারা সামান্য লোকেরই উপকার হইতেছে।

যতগুলি কারণে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালা দেশে রেল বিস্তৃতি তাহার একটী কারণ। রেলওয়ের সুবিধার জন্য বাঙ্গালার অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে গর্ত্ত পগার প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল নদী সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সংস্কার সাধন বহুব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু গর্ত্ত পগার গুলি বুজাইয়া দেওয়া বিশেষ ব্যয়ের ব্যাপার নহে। এই কার্য্যের ব্যবস্থা সরকার হইতে রেল কর্ত্তৃপক্ষকে দিয়াই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত। সহযোগীর চারুমিহির এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন,—

রেল রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বর বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে এই কথায় আর এখন সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অধিবাসীগণ এই কথার যাথার্থ্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের নিকট

ডাক্তার ও ঔষধ প্রার্থনা করিয়া এই বিপুল হস্ত হইতে স্থায়ীরূপে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহাতে স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ আবশ্যক। রেল রাস্তা ও অন্যান্য উচ্চ রাস্তার মধ্যে ঘন ঘন পোল দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া, গর্ত্ত পগার ইত্যাদি ভরিয়া ফেলিয়া জল নামিয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা আশা করি, জনসাধারণে তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদান করিবেন এবং যাহাতে ডিঃ বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ এই প্রকারে স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট হন তৎপ্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে।

জ্বরের সংবাদ বাঙ্গালায় সকল জেলা হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ত্রিপুরা হিতৈষী হে প্রকাশ,—

রোগের প্রাদুর্ভাব—মফঃস্বলের অনেক স্থান হইতেই নানাবিধ রোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জ্বর রোগ কোন কোন স্থলে মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। প্রকাশ মুরাদনগর থানার অধীন একবাইরা গ্রামে ১২৫।১৩০ জন লোক জ্বর রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একে অন্নাভাবে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে লোক দিন কাটাইতেছে, তার উপর যদি রোগের আক্রমণ হয় তবে অভাবে অপরিপুষ্ট জীর্ণ দেহ সেই ব্যাধির সহিত কয়দিন সংগ্রাম করিতে পারে? অনশন এ সকলের মুখ্য কারণ হইতে পারে, কিন্তু উহাও যে গৌণ কারণ সে বিষয় সন্দেহ নাই।

"ত্রিপুরা হিতৈষী" শুধু স্থানীয় রোগ বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই সেখানকার হাসপাতালটিরও যে দুরবস্থার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও বড় মর্ম্মভেদী। পাঠক তাঁহারই ভাষায় সে সংবাদ অবগত হউন,

স্থানীয় হাসপাতালের কথা—শ্রীযুক্ত ডিভিসন্যাল কমিশনার সাহেব এবার যখন কুমিল্লা পরিদর্শনে আগমন করিলেন, তখন তিনি স্থানীয় হাসপাতাল পরিদর্শন কালে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র ও ঔষধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। প্রকাশ, এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি কোনরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি যখন যে যন্ত্র বা ঔষধ দেখিতে চাহিয়াছেন তাহার উত্তরে না ব্যতীত হাঁ না কি শুনিতে পান নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে। এ নিমিত্ত কাহার দোষ দিব তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সহরের দাতব্য হাসপাতালে অত্যাবশ্যকীয় ও মূল্যবান যন্ত্র ও ঔষধাদি রক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সহরে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রাদি রাখিতে পারেন না, রাখা সম্ভবও নয়। কাজেই যন্ত্র ও ঔষধের অভাবে কঠিন ব্যাধিগুলি অচিকিৎসায় থাকিয়া গেলে উহা সহরের ও ও জেলাবাসীর নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। যাঁহারা ধনী তাঁহারা না হয় চিকিৎসার নিমিত্ত দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে পারেন, কিন্তু দরিদ্রের উপায় কি? এ নিমিত্ত আমাদের মনে হয়, কেবল দাদ ও পাঁচড়ার ঔষধ বিতরণের স্থান না হইয়া যাহাতে লোক দুঃসময়ে ও কঠিন রোগে সাহায্য পাইতে পারে হাসপাতালে তেমন ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন এবং ঐ সকল ক্ষেত্রেই হাসপাতালের সার্থকতা।

"এসম্বন্ধে আমাদের অপর একটি অভিযোগ আছে। হাসপাতালে সকল সময় রোগীদিগকে গ্রহণ করা হয় না। সংঘাতিক রূপে আহত ব্যক্তি দিগকেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে প্রত্যাখ্যান করা হয়, ইহা আমাদের নিজের গ্রেসের একটী লোকের সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানিতে পারিয়াছি। দুর্ঘটনা—হাসপাতালের আইন মানিয়া চলে না। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। এমতাবস্থায় কোন দুর্ঘটনায় আহত কেহ যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই বলিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখাত হয়, তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি তাহাই হয়, তবে ডাক্তারের বাসস্থান সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থাই বা কি নিমিত্ত? এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও একবার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। জানিনা তাঁহারা ইহার কোন প্রতীকার করিয়াছেন কি না?"

আমাদের দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির কারণও ইহাই। এখনকার স্কুল কলেজে

যেরূপ ধরণে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এ অবস্থায় দেশে যদি ব্রহ্মচর্য্য বিধানের প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায়, তাহা হইলে মনোমধ্যে স্বভাবতঃই আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের "প্রতিকার" সংবাদ দিতেছেন,—

ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন। কয়েক দিন হইল, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য বৈদ্যনাথধামের রায় বাহাদুরের সুরম্য অট্টালিকায় একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় অগ্রদ্বীপের জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য সুন্দররূপে সমাধা হইয়াছিল। তিনি এই সভায় উক্ত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন জন্য নগদ দশ হাজার টাকা ও এক হাজার বিঘা জমি দান করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন একটী মহৎ পুণ্যের কার্য্য। আমরা সভাপতি মহাশয়ের এইরূপ দানের প্রশংসা করি। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাঁহার দান চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কলেরার প্রাদুর্ভাব এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থানে চলিতেছে। "ঢাকাপ্রকাশে" প্রকাশ,—

সহরতলী ফরিদাবাজার অঞ্চলে 'কলেরা' রোগ দেখা দিয়াছে। তত্রত্য 'কনষ্টেবল ট্রেণিং স্কুলের' শিক্ষানবীশদের মধ্যেও নাকি কয়েক জন এই রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছে। যাহাতে সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি আর বেশীদূর ছড়াইতে না পারে, মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ অগৌণে তাহার সুব্যবস্থা করুন।

মেদিনীপুরের "নীহার" হইতেও সেখানে কলেরার আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে,—

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব—পুরীর রথযাত্রা ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই মেদিনীপুর সহরে ওলাউঠা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে অনেক লোকে মারা যাইতেছে।

"মেদিনীপুর হিতৈষিণী"তেও এই কলেরার সংবাদ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, "মেদিনীপুর হিতৈষিণী" সেখানে কলেরা বিস্তৃতির কারণেও সেখানকার পানীয় জলের দুরবস্থার কথাও উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

স্বাস্থ্য—এখনও কলেরা সহর ছাড়িলনা। মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন উক্তরোগে দেহত্যাগ করিতেছে। জ্বরাদির আবির্ভাব মন্দ নয়। চারি দিকে মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। নর্দ্দামায় জিনিষ পচিতেছে। পুষ্করিণী-আদি অপরিস্কৃত ও তাহাতে জলাভাব। গরীব লোক জলের অভাবে তাহাই পান করে।

আসাম প্রদেশ তো ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরের আবাসভূমি। সেখানকার সাতগাঁও অঞ্চলের বর্ণনা করিয়া শিলচরের সহযোগী "সুরমা"তে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এই অঞ্চলের শত শত লোক প্রতিবৎসর প্রাণত্যাগ করিতেছে—গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে। সাতগাঁয়ের ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এখন ঐ অঞ্চলের লোক গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পলাইতেছে—পারত পক্ষে সাতগাঁও এর ছায়া মাড়াইতে চাহে না,—যাহারা নিতান্ত নিরুপায়, তাহারাই গ্রামে থাকিয়া জঠরানলে আহুতি জোগাইতেছে।

বাঙ্গালাদেশে যেরূপ আধিব্যাধির পরিমাণ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় সরকার হইতে মেডিকেল স্কুলস্থাপনার চেষ্টা করিয়া চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যে একান্ত উচিত—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা এ কথা অনেকবারই বলিয়াছি। প্রত্যেক জেলার অধিবাসী-বৃন্দের ইহার জন্য চেষ্টাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, নরসিংহের অধিবাসীগণ ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সহযোগী চারুমিহির আমাদিগকে জানাইতেছেন—

এই নগরে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে স্থানীয় জন সাধারণের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এ আবেদন পত্রের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাবে উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই আবেদনপত্রে ময়মনসিংহে মেডিকেল স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে যে সকল উক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অকাট্য। উহাতে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই স্থানে মেডিকেল স্কুল স্থাপন করা আশা প্রদ। আমরা ভরসা করি, কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আর কালক্ষেপণ না করিয়া সত্বর স্কুল স্থাপনে যত্নবান হইবেন।

সহযোগী "হিন্দুস্থান"ও ময়মনসিংহে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন,—

ময়মনসিংহ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জেলা, সুতরাং সে হিসাবে দাবী যে খুব জোরাল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জেলাটিতে ৪৯,২০০ জন লোক পিছু বা ১৩২ খানা গ্রাম পিছু মাত্র একটি করিয়া চিকিৎসক আছেন। আর কোনো সভ্য দেশে এরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না।

কাজের কথা।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য—বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা ভাবিলে শুধু দুঃখ হয় না, চক্ষু ফাটিয়া জল আসে। নীরোগ দেহে স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ এখন অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, ম্যালেরিয়ার পীড়নে তাঁহারা তো চিরবিপর্য্যস্ত। সহরে বাস করিয়াও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নাই, কারণ সহরবাসের ফলে পাঁনের আনা বাঙ্গালীকে অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতে হয়। ইহার উপরে সহরে বদ্ধবায়ুর ফলে যক্ষ্মাগ্রস্থের সংখ্যাও শনৈঃশনৈঃ যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—তাহাই হইতেছে বাঙ্গালীর পক্ষে আশঙ্কার কথা।

* * *

সেকালের বাঙ্গালী।—সেকালের বাঙ্গালীর যে কখনও কোন রোগ হইত না—জ্বর-জ্বালা, অজীর্ণ এবং ক্ষয়গ্রস্থ হইয়া সেকালের বাঙ্গালী যে কখনও মরিত না—এমন কথা আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু একালের মত সেকালের বাঙ্গালী এত যে রোগে ভুগিত না এবং তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যসুখ অটুট থাকিত—ইহা সুনিশ্চয়। সেকালের বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যসুখ অটুট থাকিত বলিয়াই সেকালের বাঙ্গালী যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারিত একালের বাঙ্গালীর নিকট সে ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালী এখন একপোয়া পথ হাঁটিতেও কষ্ট বোধ করে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন বাঙ্গালী শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য বাঙ্গালার সুদূর পল্লী হইতে পুরী পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইতে কষ্ট বোধ করিতেন না। এখন দেশে যেরূপ নানা প্রকার যান বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পথপর্য্যটনের অভ্যাস হইতেও বাঙ্গালীকে রক্ষিত হইতে হইয়াছে।

উন্নতি না অবনতি।—কিন্তু এই শ্রমবিমুখতা বাঙ্গালী জাতির উন্নতি কি অবনতির পরিচায়ক, তাহা ভাবিবার কথা। শ্রমবিমুখতার ফলে একদিকে বাঙ্গালীর শারীরিক অবনতি ঘটিতেছে, অন্য দিকে বাঙ্গালী-বড়লোকদিগের দেখাদেখি বাঙ্গালী-দরিদ্রও নিজের অবস্থা না বুঝিয়া শ্যামবাজার হইতে হেদুয়ার মোড় পর্য্যন্ত যাইতে হইলেও ট্রামে চড়িয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে। দেশে দশ টাকা মণ চাউল, বাঙ্গালার অনেক স্থানের লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না, এ অবস্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ অভ্যাসের প্রশ্রয় পাওয়া উচিত কিনা—তাহা কি বিবেচনার বিষয় নহে। বাঙ্গালী মরিতেছে তো ইহারই জন্য।

* * *

মানসিক শ্রম।—বাঙ্গালী শারীরিক শ্রম করিতে আর অভ্যস্ত নহে। কিন্তু মানসিক শ্রমটা বাঙ্গালীর যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। বাল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের জন্য এবং তাহার পর বিশ্বপণ্ডিত রূপে বাহির হইয়া গোলামি বজায় রাখিবার জন্য এই মানসিক শ্রমটা বাঙ্গালীকে অতিরিক্তই করিতে হয়। কর্ম্মময় জীবনে যাঁহারা সেরূপ মাথা ঘামাইতে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের আর্থিক উন্নতিও অসম্ভব। কাজেই বাঙ্গালীজাতি একদিকে যেরূপ শ্রমবিমুখতার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন ঘটাইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ অতিরিক্ত মানসিক চিন্তায় স্নায়ুরোগগ্রস্ত হইবার কারণ উৎপন্ন করিয়া তুলিতেছে। শুধু বিশ্বপণ্ডিত হইলে চলিবে না, দাসত্বের বড় বড় অভিধানে সন্তুষ্ট থাকিলেও চলিবেনা, ইহার ফলে আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াইতেছে, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই কি চিন্তা করা উচিত নহে?

সমালোচনা।

শিশুপালন। ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম, বি সম্পাদিত। মূল্য ॥০ আনা। এখনকার দিনে শিশুমৃত্যুবাহুল্যের যুগে কার্ত্তিক বাবুর মত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক যে বহুল কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও এরূপ গ্রন্থ সম্পাদনে সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ধন্যবাদের পাত্র। ভারতে প্রত্যেক মিনিটে চারিটি করিয়া শিশু মরে। আমরা হোমরুল লইয়া ব্যস্ত, বক্তৃতার কণ্ঠে দেশ কাঁপাইয়া তুলিতেছি, কিন্তু দেশবাসীর কি করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে, কি করিয়া শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দেশ হইতে লোপ পাইবে—সে কথাটা একবার চিন্তা করিতেছি কি? দেশরক্ষা করিতে হইলে সকল চিন্তা অপেক্ষা আগে শিশুরক্ষার জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের দেশে শিশু মৃত্যু-বাহুল্যের সর্ব্বপ্রধান দায়ী আমরাই।—আমরা ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়া গিয়াছি, কিরূপ সময়ে উপযুক্ত স্ত্রীপুরুষের মিলনে গর্ভ ধারণের ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে

পারে—সে চিন্তা কয়জন দেশবাসী করিয়া থাকেন? তাহার পর সন্তান লাভ হইল তো—সে সন্তান প্রকৃত কর্ম্মীপুরুষ হইবে কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজনও নাই। স্থির, ধীর শান্তভাবে —বিশ্ববিদ্যালয়ের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সে ছেলে একজন বড় চাকরে হউক ইহাই এখনকার প্রত্যেক পিতামাতার কামনা। একে আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা নাই—স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সকল আমরা অনবগত, তাহার ফলে দুর্ব্বল, রুগ্ন, অকর্ম্মী শিশু লাভ তো আমাদের নিত্য ঘটিতেছে, তাহার উপরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষায় ছেলেদের অর্দ্ধেক পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে, —সে যে অধিকতর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে এবং সেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে যে নানা কারণে আমরা উপযুক্ত আহার দিতে অসমর্থ—এ সকল কথা আমরা কয়জন ভাবিয়া থাকি? কার্ত্তিক বাবু এ সকল কথা চিন্তা করিয়াছেন। এ পুস্তক তাহারই ফলসম্ভূত। কাজেই পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। এ পুস্তক পড়িলে বাঙ্গালী-পিতামাতার অনেক শিক্ষা লাভ হইবে, আমরা সকলকেই এরূপ একখানি অবশ্য প্রয়োজনীয় পুস্তক পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শরীর তত্ত্ব। Phisiology ৪র্থ সংস্করণ। শ্রীরাজেন্দ্রলাল সুর এল, এম, এস, সি প্রণীত ও ৮৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরামলাল সুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। মানবদেহের গঠন কিরূপ, কিরূপেই বা নির্ম্মিত এবং ইহার কার্য্যাই বা কিরূপে সম্পাদিত হয়, এ সকল বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাবে এ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তকখানি চিকিৎসার প্রথম শিক্ষার্থিগণের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

অস্থিতত্ত্ব। Osteology, ৩য় সংস্করণ। ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রলাল সুর এল, এম, এস, সি প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। এ পুস্তকে অস্থিতত্ত্বের বর্ণনা উত্তমরূপে বর্ণিত। যাঁহারা অস্থিরহস্য অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ পুস্তক প্রয়োজনীয়। এরূপ ধরণের পুস্তকের ভাষা স্বভাবতঃই দুরূহ হইবার কথা, কিন্তু আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই গ্রন্থের রচয়িতা সে পক্ষেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব সহজকথায় গ্রন্থখানি প্রণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে মনে হইল। মূল্য আর একটু কমাইয়া দিলে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে।

তিব্বেমসিহা বা সহজ হাকিমী শিক্ষা।—১ম খণ্ড। হাকিম মসিহর রহমান কোরায়শী প্রণীত। ১১৪ ও ১১৫ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা। এখানি হাকিমী চিকিৎসার উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে সকল রোগের পরিচয় লিখিয়া তাহার চিকিৎসা-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা হাকিমী চিকিৎসা শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা উপকারে আসিবে।

চিকিৎসক।—ডাঃ এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস প্রণীত। ৬৪ নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট হইতে মজুমদার এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—১৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। এখানি হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ। হোমিওপ্যাথি কি? প্রথমেই তাহার বিবরণ দিয়া তাহার পর স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি, রোগীর পথ্যাপথ্য ও মেটিরিয়া মেডিকার পরিচয় দিয়া, তাহার পর রোগী পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা-প্রণালীর কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার

"হোমিওপ্যাথি কি ?"—বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের মূলসূত্র এক।" বাস্তবিক তাহাই ঠিক। হোমিওপ্যাথির মতে যেরূপ স্বল্প মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগে শুভফলের আশা করা যায়, আয়ুর্ব্বেদবেত্তারাও বহুযুগ পূর্ব্বে তাহাই করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এ গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়,—এ গ্রন্থের গ্রন্থকার বায়ু-পিত্ত-কফ-নির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী। সেইজন্য তাঁহার প্রাকটিস বা চিকিৎসার বর্ণিত অংশ বিচক্ষণতার সহিত লিখিত হইয়াছে মনে হয়। গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণের উপকারে আসিবে।

স্বস্তিকা। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। ৫৫নং চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। এ গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা যায়, সুখ দুঃখের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রের অবিশ্রাম কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সোয়াস্তি পাইবার উপায় স্বরূপ অবসর মত ইহার কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে। এইজন্য ইহার নামকরণ হইয়াছে স্বস্তিকা। ইহার কবিতাগুলি মনোমদ। কবিতাগুলিতে গ্রন্থকারের ভগবদ্ভক্তির পরিচয় প্রত্যেক ছত্রে প্রকটিত। গ্রন্থকার কর্ম্মক্ষেত্রের অবিশ্রাম কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সোয়াস্তি পাইবার জন্য স্বস্তিকা লিখিয়াছেন বটে—কিন্তু ঐরূপ কর্ম্মক্লান্ত পাঠকও এগ্রন্থ পাঠে যে সোয়াস্তি পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা, কাগজ ও বাঁধান অতি সুন্দর।

প্রচারক। হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্র। ডাঃ এ, সি, মজুমদার সম্পাদিত। ৪র্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। বার্ষিক মূল্য ২।০। ১৩০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচারোদ্দেশে এই মাসিকপত্রের প্রকাশ। আলোচ্য সংখ্যায় যে কয়টি সন্দর্ভ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে বালকগণের সর্ব্বনাশকারী পীড়া ও প্রতিকারের ব্যবস্থা" ও "শিশুপালন" পাঠে সাধারণের উপকার হইবে। হৃদরোগে "অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল—গবেষণামূলক সন্দর্ভ। "রোগীবিবরণ" হোমিওপ্যাথি চিকিৎকদিগের উপকারে আসিবে। সম্পাদকীয় মন্তব্য যদি স্বাস্থ্যতত্ত্ব লইয়া লিখিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পাঠকের উপকারের আশা বেশী করা যায়। "একনাইটের গুণ"—কবিতাকারে আমাদের ভাল লাগিল না। "চিকিৎসার চেয়ে রোগবিবরণ শ্রেয়ঃ।"—এরূপ প্রবন্ধ হোমিওপ্যাথিক ডোজে প্রকাশ করা পাঠকের ধৈর্য্যহানি ঘটিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী পরীক্ষার ফল।

(১ম শ্রেণী)

বিজয় কান্ত সেন বি, এ,

(২য় শ্রেণী)

প্রমীলা বালা দাসী। সরোজিনী দেবী। সরযূ বালা দেবী। বিপিন বিহারী বিদ্যাবিনোদ। যতীন্দ্র প্রসাদ রায়।

(মধ্য পরীক্ষা)

(১ম বিভাগ)

জ্যোতীশ্চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণতীর্থ। অম্বিকা চরণ কাব্যতীর্থ। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। রঘুনন্দন প্রসাদ মিশ্র। সীতাবর পান্থ।

(২য় বিভাগ)

যোগেন্দ্র সিংহ দে। ধীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীচন্দ্র শর্ম্মা। জানকী বল্লভ পান্ত। কেশব লাল চক্রবর্ত্তী। কিশোরী শরণ দীক্ষিত। ভানুদত্তপাঠক। বৈদেহীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

আদ্য পরীক্ষা

১ম বিভাগ

কিশোরী শরণ দীক্ষিত। দেবদত্ত পান্তের। মুরারি সিংহ বর্ম্মা। জগদীশ প্রসাদ পান্তে। টীকারাম শর্ম্মা। বুদ্ধিবল্লভ পান্তের।

IMPERIAL

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—ভাদ্র। | ১২শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

কলিকাতায় শিশু মৃত্যু।—সকল দেশ অপেক্ষা কলিকাতায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ কলিকাতায় বিশুদ্ধ গবীদুগ্ধ পাওয়া সুকঠিন। কলিকাতাবাসীগণ যে দুগ্ধ পাইয়া থাকেন, তাহা মফঃস্বল হইতে রেলযোগে এখানে আমদানি হইয়া থাকে। সে অবস্থায় গবী—সুস্থ কি অসুস্থ, দুর্ব্বল কি রুগ্ন, উহার দুগ্ধ ফুকা দিয়া দোহন করা কিনা—এ সকল বিষয় কাহারও দেখিবার প্রয়োজন হয় না, দুগ্ধ পাইলেই হইল! শুধু জল মিশাইলেই যে দুগ্ধের কৃত্রিমতা দোষ ঘটে তাহা নহে, উপরোক্ত কারণগুলি হইতেও দুগ্ধ বিকৃত হইয়া থাকে। ফলে কলিকাতা সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের যথেষ্ট অভাব এবং তাহারই জন্য শিশুদিগের যকৃতের রোগ এবং তাহার পরিণতি অকাল মৃত্যু। কলিকাতা সহরে এমনই করিয়া infant leaver বা যকৃত রোগে অসংখ্য শিশু কাল-কবলিত হইতেছে। যাঁহারা শিশুমৃত্যু নিবারণের জন্য চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে কলিকাতাবাসীগণ যাহাতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করুন—তবে কলিকাতায় অকালমৃত্যুর কবল হইতে শিশুগণ রক্ষা পাইবে।

* * *

দুগ্ধ সম্বন্ধে সতর্কতা।—দুগ্ধ সম্বন্ধে মার্কিনের অধিবাসীগণ যেরূপ সতর্ক, এমন আর কোনো দেশের অধিবাসীগণ নহেন। ভারতের অধিবাসীদিগের পক্ষে যে বিচার শক্তির ব্যবস্থা অতীত যুগে ছিল, মহাকবি কালিদাস তাহারই ফলে আসমুদ্র ভূমণ্ডলের সম্রাট দীলিপকে দিয়া গোচারণের চিত্র প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ভারতবাসীর নিকট এখন সে বিচারশক্তি লোপ পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের স্পৃহাও এখন অনেক ভারতবাসীর নাই বলিলেও চলে। যাঁহাদের সে স্পৃহা এখনো লোপ পায় নাই তাঁহারা বাছ্ বিচারের

ব্যবস্থা রাখেন না, দুগ্ধ পাইলেই হইল,—তা' যেমনই কেন হউক না! বিলাতেরও নাকি এই অবস্থা! বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন" পত্রে প্রকাশ, বিলাতে অনেক স্থানেই দুগ্ধে আবর্জ্জনা থাকে এবং তাহারই জন্য সেখানে টাইফয়েড, যক্ষ্মা, গলনালীর ক্ষত প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশেও যে এই একই কারণে ঐ সকল রোগের বাহুল্য ঘটিতেছে না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? এখন কলিকাতায় যক্ষ্মায় যত লোক মরে, আগে কি এত মরিত? টাইফয়েডও তো এখন যথেষ্ট বাড়িয়াছে। গলনালীর ক্ষত বা ডিপথিরিয়াও এখন শিশুদিগের একটী সংক্রামক ব্যাধি। আমাদের দেশের দুগ্ধ বিকৃতির ফলে তো আমরা এ সকল রোগ ভোগ করিতেছিই, তা' ছাড়া যে বিলাতী কাগজে বিলাতী দুগ্ধের নিন্দাস্রোতঃ অতি ভীষণভাবে প্রবাহিত হইতেছে, অনেক সময় সহজসুলভ মনে করিয়া সেই "গোয়ালিনীমার্কা খাঁটি দুগ্ধ"-কেও আমরা সাদরে আনয়ন পূর্ব্বক পান-সুখ উপভোগ করিতেছি! বিলাতে যে দুগ্ধ সাধারণ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার অভিধান মার্কিনে তৃতীয় শ্রেণীর দুগ্ধ। তাহা "রন্ধন ও পণ্য প্রস্তুত করিবার জন্যই ব্যবহারের যোগ্য" বিক্রয়ের সময় বলিয়া দিতে হয়। আমরা কিন্তু বিলাতী জমাট দুগ্ধ ব্যবহার সময়ে এ সকল কথা কিছুই ভাবিয়া দেখি না। ধিক আমাদের! আমাদের দেশে প্রতিমিনিটে চারিজন করিয়া শিশু মরিবে না তো মরিবে কোন্ দেশে?

* * *

পাঁউরুটী।—পাঁউরুটীর প্রচলনটাও এখন আমাদের দেশে যথেষ্ট। সখ্ করিয়া এবং জলখাবারের সময়ে তো এই পাঁউরুটি অনেক পরিবারেই ব্যবহৃত হয়, তা' ছাড়া অনেক সংসারে নৈশভোজনেও হাতেগড়া রুটীর পরিবর্ত্তে পাঁউরুটীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁউরুটী কিন্তু যেরূপ ভাবে প্রস্তুত হয় তাহার তথ্য অবগত হইলে স্বভাবতঃই ঘৃণা উপস্থিত হইবার কথা। পাঁউরুটী প্রস্তুতের সময় দুই পা দিয়া উহার উপাদান দ্রব্যকে বিশেষভাবে মর্দ্দন করিয়া লওয়া হয়, ইহার অন্যথায় পাঁউরুটী প্রস্তুত হইতে পারে না। তাহার পর, প্রতিদিন যতগুলি পাঁউরুটী প্রস্তুত হয়—তাহা সেইদিনই সমস্ত বিক্রয় হয় না, কাজেই তাহার পরদিনও সেই বাসিরুটী বিক্রয় না করিলে উহার ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। পাঁউরুটী-প্রিয় খরিদদারগণ কিন্তু সে সকল বিষয় ভাবিবার অবসর পান না। কলিকাতায় এই পাঁউরুটীপ্রিয় ব্যক্তিগণই কিন্তু অধিক অজীর্ণগ্রস্থ। মফঃস্বলেও যে সকল স্থানে ইহার প্রচলন কলিকাতারই মত, সে সকল স্থানের অধিবাসিগণও অজীর্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পান না। আমরা উদাহরণস্বরূপ নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নাম উল্লেখ করিতে পারি। নদীয়ার রাণাঘাট ষ্টেশন ই, বি, রেলের একটি বড় জংসন। এখানে এই উপলক্ষে অনেকগুলি লোক পাঁউরুটীর ব্যবসায় পূর্ণোদ্যমে চালাইয়া থাকে। রাণাঘাট এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বাসিন্দাগণও এইজন্য দারুণ অজীর্ণ প্রবণ।

* * *

শিশুশরীরে পাঁউরুটী।—অনেকে আবার পা দিয়া চটকান পাঁউরুটীর আস্বাদন নিজেরা উপভোগ করিয়াই পরিতৃপ্ত নহেন, তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তান-সন্ততিগণকেও ইহার প্রসাদ দিয়া আনন্দ অনুভব করেন। সে আনন্দ কিন্তু শেষে যকৃত বিকৃতির ফলে নিরানন্দে পরিণত হয়। তখন অনেক সময় কায়-মনোবাক্যে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করিয়াও ফললাভ হয় না। দেশে দুগ্ধের দুর্গতি, তাহার জন্য আমরা কদর্য্য দুগ্ধ ব্যবহার করাইয়া শিশু মৃত্যুর কারণ করিয়া তুলিতেছি,—ইহার উপর পাঁউরুটীর মত তাড়ি-মিশ্রিত দ্রব্য শিশুদিগের মুখে তুলিয়া দিতে অভ্যস্ত হইয়া যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করিতেছি, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না—ইহাই দুঃখ।

* * *

আমাদের খাদ্য।—আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের তো অভাব নাই,—যে স্থলে আমরা পাঁউরুটীর ব্যবহার করিয়াথাকি, সে স্থলে বাঙ্গালা দেশের সহজ সুলভ খাদ্য 'মুড়ি' যে কত উপকারী তাহা বলিবার নয়। মুড়ির মত সহজপাচ্য খাদ্য অতি অল্পই আছে। আগে পল্লীগ্রামে এই মুড়ির প্রচলন যথেষ্ট ছিল. তখনকারদিনে সকল সংসারেই মুড়িভাজার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, অনেক সংসারে সকালে বিকালের জলখাবার ছিল সেই মুড়ি। এখনও সেই মুড়ির প্রচলন বাঙ্গালার বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া-মালদহ-মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে লোপ পায় নাই। যে সব দেশে পাঁউরুটীর প্রচলন কম, সে সব দেশের লোকে এই জন্যই দক্ষিণ বাঙ্গালার মত এত অজীর্ণগ্রস্থ নহে।

* * *

মুড়ি ও বিস্কুট। এখনকার দিনে অনেকে পাঁউরুটীর মত বিস্কুটও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার ফলে আমাদের দেশের বিস্কুট-নির্ম্মাতাগণ অর্থাগমের পন্থা বড় বেশী সুলভ করুন আর না করুন, বিলাতী বিস্কুট ব্যবসায়ীরা কিন্তু যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। অনেক সংসারেই এখন দেখিবেন—আলমারির তাকে টিন ভরা বিস্কুট গৃহস্বামীর সমৃদ্ধি গৌরব প্রকাশ করিতেছে। এই বিস্কুটগুলি যে কতদিন পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া, কত সাগর মহা-সাগর অতিক্রম করিয়া আমাদের দেশে আসিয়া পঁহুছিয়াছে এবং কতকাল পূর্ব্বের প্রস্তুত সেই দ্রব্য সম্ভারকে আমরা উৎকৃষ্ট আহারীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না—তাহা কিন্তু আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই,—ক্ষমতাও নাই। দেখিতে চমৎকার,—খাইতে সুস্বাদু—মুখে দিলেই মিলাইয়া যায়—ইহাই তো সে দ্রব্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র! সে দ্রব্য—কে—কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়াছে—কোন্ দেশ হইতে কিরূপভাবে কবে আসিয়াছে এবং সেই দ্রব্য বহুকালাবধি পর্য্যুসিত হওয়ার ফলে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে শুভদ হইতে পারে কি না—এ সকল বিষয় আমাদের চিন্তা করা উচিত নহে কি? আমাদের দেশে 'মুড়ি' এই বিস্কুট অপেক্ষা বহুল পরিমাণে উপকারী। যেস্থলে কোনো প্রকার খাদ্য জীর্ণ করান সুকঠিন, সেস্থলে এই মুড়ি ব্যবস্থায় যথেষ্ট

সুফল পাওয়া গিয়াছে। হিক্কা নিবারণে মুড়ির জল অমোঘ ঔষধ। তবে আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে 'মুড়ি' খাইতে লজ্জা বোধ করি—কারণ দরিদ্র বিবেচনায় আমরা ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়িব—এই যা' কথা।

* * *

খাদ্যে বিষ।—সেকালে দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাওয়ার প্রথা কমই ছিল। সেকালে এখনকার মত নানারূপ খাদ্যের ব্যবস্থাও ছিল না। মুড়ি-নারিকেল, আদা-ছোলা-ভিজা, গুড়-বাতাসা—ইহাই ছিল সেকালের সাধারণ গৃহস্থের জলখাবার। বড় লোকেরা ইহার উপর সন্দেশ-রসগোল্লা ব্যবহার করিতেন। ক্ষীর-ছানা-মাখন নবনী—দুগ্ধজাত এ দ্রব্যগুলি সেকালে গরীবেও খাইত, মহতেও খাইত। এ কালে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা লবণাক্ত খাদ্যসম্ভারের অধিক পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, কলিকাতার কচুরি-শিঙ্গাড়ার দোকানগুলি তাহারই ফলে সমৃদ্ধি সম্পন্ন। যদি উৎকৃষ্ট ঘৃতে সে সকল প্রস্তুত হয় এবং দেশের লোক তাহা খাইবার জন্য বেশী আগ্রহান্বিত হয় তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই,—কিন্তু অনেকস্থলেই ঐ সকল দ্রব্য গলাধঃকরণের কিছুক্ষণ পরেই বুক জ্বলিতে থাকে, অম্লোদ্গার উঠিয়া থাকে, সেরূপ অবস্থায় সে সকল খাদ্য পাকস্থলীতে পঁহুছিয়া যে বিষবৎ ক্রিয়া উৎপন্ন করে তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই। আমরা ই, বি, এস, রেলওয়ের দু' একটি ষ্টেসনের কথা জানি,—সে সকল স্থানের লবণাক্ত খাদ্য খাওয়ার পরই ঐরূপ অম্লোদ্গার হইয়া থাকে। রাণাঘাট ষ্টেসনের 'গরম-শিঙ্গাড়া' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা এই প্রসঙ্গে রাণাঘাটের সবডিবিসন্যাল অফিসার মহাশয়কে এ সকল রহস্য ভেদ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

* * *

কলিকাতার চপ-কাটলেট। এখনকার দিনে কলিকাতার চপ-কাটলেটের দোকানগুলি হইতেও আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির কম অন্তরায় ঘটিতেছে না। অনেক স্থলে যেরূপ মাংস প্রভৃতির মিশ্রণে উহা প্রস্তুত করা হয়—তাহা আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির তো সমূহ বিঘ্নোৎপাদক বটেই, কখনও কখনও বিষ-ক্রিয়াও সদ্যঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে—গত বৎসর চৈত্র মাসে হ্যারিসনরোডের এক রেষ্টারেণ্ট বা চপ-কাটলেটের দোকানে ছয়টি বাঙ্গালী ছাত্র আহার করিতে গিয়াছিল; আহার করিয়া মেসের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরই ছয়জন পীড়িত হয়। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়, ফলে পাঁচটি ছাত্র চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিল, একটি কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত হইল। খাদ্যপরীক্ষক মহাশয় সংবাদ পাইয়া সেই রেষ্টারেণ্টে গিয়া খাদ্য পরীক্ষা করিলেন এবং পচা খাবারের জন্যই যে অনিষ্টোৎপাদন হইয়াছে তাহাও প্রকাশ করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি লোকের চৈতন্য হইবে না? এখনকার দিনে ঐরূপ চপ-কাটলেটের দোকানে আহার করায় জাতি ধর্ম্ম তো নষ্ট হইতেছেই, তা' ছাড়া স্বাস্থ্যের অপচয়ে আমাদের পরমায়ু হ্রাসেরও যে কারণ ঘটিতেছে—ইহাই কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা।

* * *

বাঙ্গালীর বাঁচিবার ব্যবস্থা।

বাঙ্গালীকে যদি বাঁচিতে হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীকে আবার সেকালের আহারের ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আর্য্য ঋষিমণ্ডলী ফলমূলাশী ছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদের পরমায়ু লাভ যেরূপ ঘটিত তাহা এখন আরব্যোপন্যাসের কিম্বদন্তী বলিয়া পরিগণিত। ফলভক্ষণে রক্তের ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হয়, মেধা ও স্মৃতি শক্তি প্রখর হয়। জীবনে নূতন রক্তকণিকা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশে সাময়িক ফলমূলেরও অভাব নাই, কিন্তু "বাঙ্গালীর তাহা ভক্ষণের আগ্রহ নাই—এই যা' কথা। দুঃখের কথা তো বলিয়াছিই, কিন্তু বাঙ্গাদেশের ঘরে ঘরে আবার গাভী পালনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হউক, বাঙ্গালী আবার ভারতচন্দ্রের পাটনীর কথার মত 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এরূপ কামনা করিতে থাকুক"—এরূপ উপদেশ দিলে শীঘ্র ফলোপদায়ক হইবে না। চাকরিজীবি-প্রবাসী-বাঙ্গালীর পক্ষে জীবনের গতিস্রোতঃ ফিরাইয়া দিয়া আবার পল্লীবাসী হইতে না পারিলে সে ব্যবস্থা হইবে না, কিন্তু তাহা সুদূরপরাহত। তবে চপ-কাটলেটের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া, বাজারের চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃতে প্রস্তুত কচুরি-শিঙ্গাড়ার লালসা বিসর্জ্জন দিয়া জলখাবারের স্থলে ফলমূলকে স্থান দান করা বাঙ্গালীর পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার নহে। বাঙ্গালী যদি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে—তাহা হইলে বাঙ্গালীজাতি আবার রক্ষা পাইবে, নতুবা Imperial Gazetter of India গ্রন্থে সরকারী মৃত্যু তালিকায় বাঙ্গালাদেশের মৃত্যুর হিসাব প্রতিবৎসরই যেরূপ বর্দ্ধিত দেখা যাইতেছে—তাহা আরও বর্দ্ধিত দেখিতে হইবে এবং কালে সেই মৃত্যু সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যে, সত্য সত্য বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বও বুঝি দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে।

শারীর বিদ্যা।

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ,এল, এম, এস]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

মণিবন্ধসন্ধি।—ইহাতে বহিঃ-প্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তস্থ খলের ন্যায় গর্ত্তযুক্ত অংশের সহিত অর্দ্ধচন্দ্র ও নৌনিভ নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের খল্লকোর সন্ধি হইয়া থাকে। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্ত সাক্ষাৎভাবে এই সন্ধিতে কূর্চ্চাস্থির সহিত সংহিত হয় না, পরন্তু তৎসংসক্ত ত্রিকোণ তরুণাস্থি 'উপলক' নামক কূর্চ্চাস্থির সহিত সংহিত হইয়া থাকে। বহিঃপার্শ্বে, অন্তঃপার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত চারিটী স্নায়ু এই সন্ধির বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করে।

[৪৪শ চিত্র—মণিবন্ধসন্ধি (সম্মুখতল)]

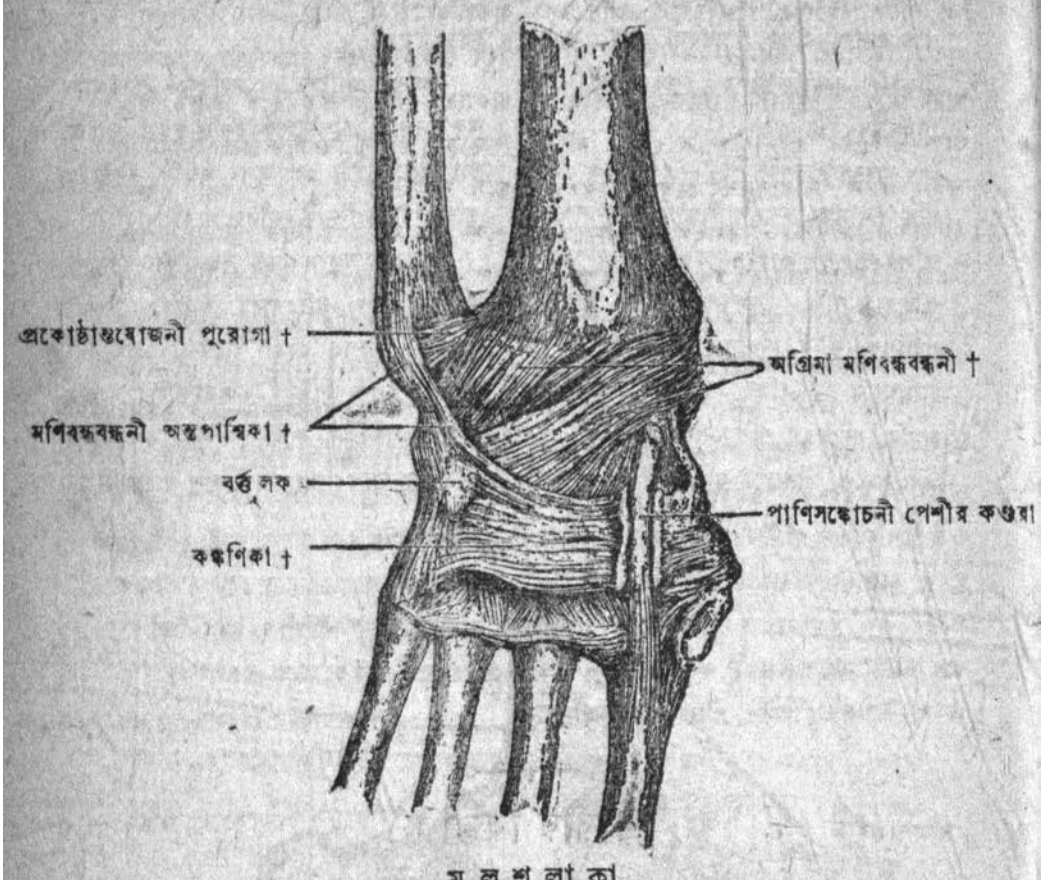

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

চেষ্টা—এই সন্ধি সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে খেলিয়া থাকে। এই সকল চেষ্টার মিশ্রণে নানাবিধ বিবর্ত্তনরূপ চেষ্টা সম্পন্ন হয়। হস্তে ভার-ধারণের সুবিধার্থ এই সন্ধির স্নায়ুগুলি শিথিল ও স্থিতিস্থাপক।

শ্লেষ্মধরা কলা—এই সন্ধির মধ্যস্থ শ্লেষ্মধরা কলা শিথিল এবং প্রচুর শ্লেষক-শ্লেষ্মযুক্ত।

করকূর্চ্চান্তরীয় সন্ধি—কূর্চ্চাস্থিসমূহের পরস্পর সন্ধি 'প্রতর সন্ধি' নামে অভিহিত। এই সন্ধিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—উর্দ্ধশ্রেণীর অস্থিগুলির পরস্পর সন্ধি, অধঃশ্রেণীর অস্থিগুলির পরস্পর সন্ধি এবং উর্দ্ধ ও অধঃশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সন্ধি। সকলগুলিই স্নায়ুপট্টিকা দ্বারা উপরে, নিম্নে ও উভয় পার্শ্বে এরূপ ভাবে সম্বদ্ধ যে

সংহিত কূর্চ্চাস্থিগুলি একখানি অস্থি বলিয়া ভ্রম হয়। তবে 'বর্ত্তুলক' নামক কূর্চ্চাস্থিটী এই সন্ধির বহির্ভাগে দুইটী পৃথক্ স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। কূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে নানা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট শ্লেষ্মধরা কলা বর্ত্তমান থাকে। কূর্চ্চাস্থিগুলির চলত্ব অতি অল্প পরিমাণে দেখা যায়।

করতলসন্ধি—এই সকল কোর-সন্ধি প্রধানতঃ করতল নির্ম্মাপিকা মূলশলাকা-গুলির সহিত কূর্চ্চাস্থিসমূহের ও অঙ্গুলিনলক-গুলির সন্ধি। মূলশলাকাগুলি উর্দ্ধদিকে পর্য্যাণক, কূটক, মধ্যকূট ও ফণধর নামক চারিখানি কূর্চ্চাস্থির সহিত, অধোদিকে অঙ্গুলি সমূহের পশ্চিমনলকগুলির সহিত এবং সমূলে পরস্পর সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সন্ধির বিষয় অস্থিবর্ণন প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ছয়টী পশ্চাতে, আটটী সম্মুখে ও দুইটী মধ্যস্থলে—এইরূপে বিস্তৃত ষোলটী স্নায়ু দ্বারা ইহাদের সন্ধিবন্ধন হইয়া থাকে।

করাঙ্গুলি সন্ধি—চৌদ্দখানি অঙ্গুলিনলকে চৌদ্দটী কোরসন্ধি হইয়া থাকে, যথা অঙ্গুষ্ঠে দুইটী এবং অপর অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীতে তিনটী করিয়া বারটী।

প্রত্যেক অঙ্গুলিসন্ধির বন্ধন কার্য্য সম্মুখে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত তিনটী স্নায়ুদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'প্রসারণী' সংজ্ঞক পেশীসমূহের কণ্ডরাগুলির দ্বারা উহাদের পৃষ্ঠবন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া প্রয়োজনাভাবে স্বতন্ত্র পৃষ্ঠগা স্নায়ু থাকে না।

[৪৫শ চিত্র—বঙ্ক্ষণসন্ধি]

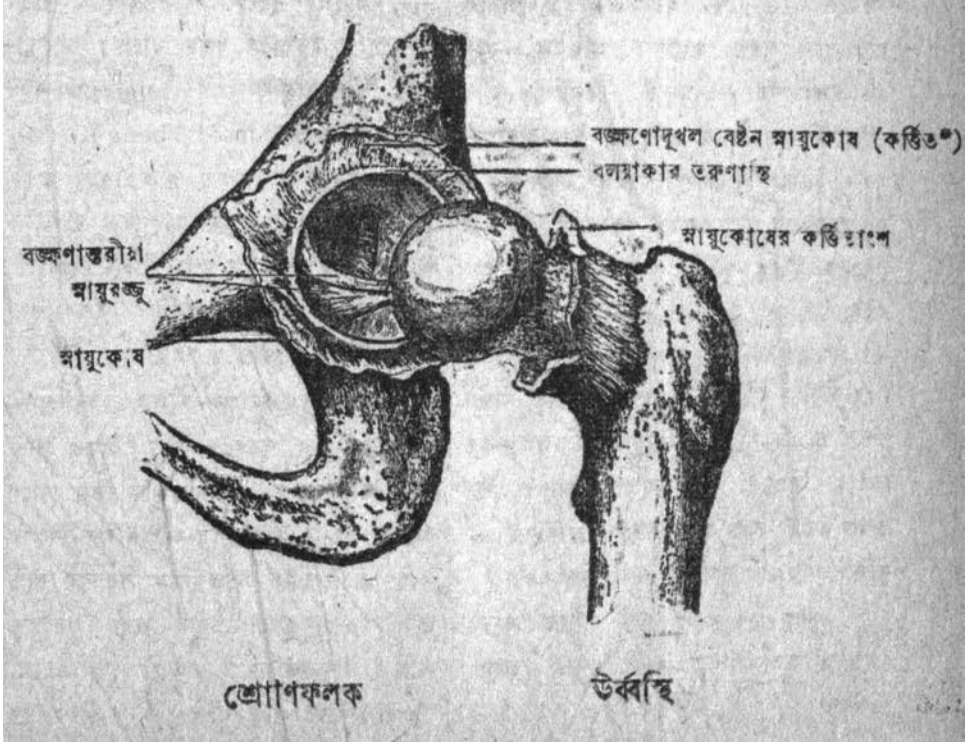

চেষ্টা—করাঙ্গুলিসমূহ সঙ্কোচ, প্রসার অন্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণরূপ চেষ্টাবান্। অঙ্গুষ্ঠের অপসামর্থ্য আছে অর্থাৎ অন্য অঙ্গুলী-সমূহের উপর উহার অগ্রভাগ যথেচ্ছ ঘুরিতে পারে।

অধঃশাখা সন্ধি।

অধঃশাখার সন্ধি প্রায় ঊর্দ্ধশাখার ন্যায় কেবল অবস্থান ভেদ বশতঃ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়।

বঙ্ক্ষণসন্ধি—শ্রোণিফলকের তরুণাস্থি বেষ্টিত বংক্ষণোদূখল নামক কোটরে ঊর্ব্বস্থির মুণ্ড সংহিত হইয়া এই উদূখলসন্ধি নির্ম্মাণ করে। এই স্থানের বৃহৎ স্নায়ুকোষের অভ্যন্তর ভাগ ব্যাপিয়া বৃহৎ শ্লেষ্মধরা কলা থাকে। এই মহান্ স্নায়ুকোষ বংক্ষণোদূখলের পরিধি হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্ব্বস্থির গ্রীবার চারিদিকে সম্বদ্ধ থাকে। অধিকন্তু ইহা শ্রোণিফলকের অবয়বভূত তিনখণ্ড অস্থি হইতে উদ্গত তিনটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। তদ্ভিন্ন 'বংক্ষণসন্ধ্যন্তরীয়া' নামে একটী দৃঢ় স্নায়ুরজ্জু স্নায়ুকোষের ভিতরে, বংক্ষণো-দূখলের মধ্যস্থ গভীর কোটর হইতে উদ্ভূত হইয়া ঊর্ব্বস্থির মুণ্ডস্থিত গর্ত্তে সম্বদ্ধ থাকিয়া এই সন্ধিকে আরও দৃঢ় করিয়া থাকে।

জানুসন্ধি—ঊর্ব্বস্থি, জাঘস্থি ও জঙ্ঘাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত এই সন্ধিটী নানা-প্রকারে বন্ধনযুক্ত হইলেও বিশেষ চেষ্টাবান্। তন্মধ্যে জানুকপালের সহিত ঊর্ব্বস্থির ও জঙ্ঘাস্থির প্রতরসন্ধি এবং ঊর্ব্বস্থির সহিত জঙ্ঘাস্থির কোরসন্ধি হইয়া থাকে। অনু-জঙ্ঘাস্থি জানুসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না, জঙ্ঘাস্থির পশ্চাতে পৃথক্‌ভাবে সংহিত হয়।

একটী পাতলা অথচ দৃঢ় স্নায়ুকোষ ঊর্ব্বস্থি, জাঘস্থি ও জঙ্ঘাস্থিকে বেষ্টন করিয়া এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য প্রধানতঃ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। অধিকন্তু এই স্নায়ুকোষ সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত চারিটী স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। তন্মধ্যে সম্মুখের স্নায়ুরজ্জুটী ঊরুপ্রসারণী পেশীচতুষ্টয়ের সম্মিলিত কণ্ডরার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, ইহারই মধ্যস্থলে ভিতরদিকে জানু-কপালাস্থি দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ থাকে। এইজন্য কেহ কেহ জানুকপালকে কণ্ডরামধ্যস্থ বৃহৎ চণকাস্থি (Sesamoid bone) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জানুসন্ধির অভ্যন্তরে অপর পাঁচটী স্নায়ু এবং যোজকরজ্জুসম্বদ্ধ দুইখানি অর্দ্ধচন্দ্রাকার তরুণাস্থি আছে। এই তরুণাস্থি দুইখানির প্রান্তভাগ জঙ্ঘাস্থির শিরঃস্থিত বিবুধ কণ্টকের দুইদিকে সম্বদ্ধ।

[৪৬শ চিত্র—জানুসন্ধি]

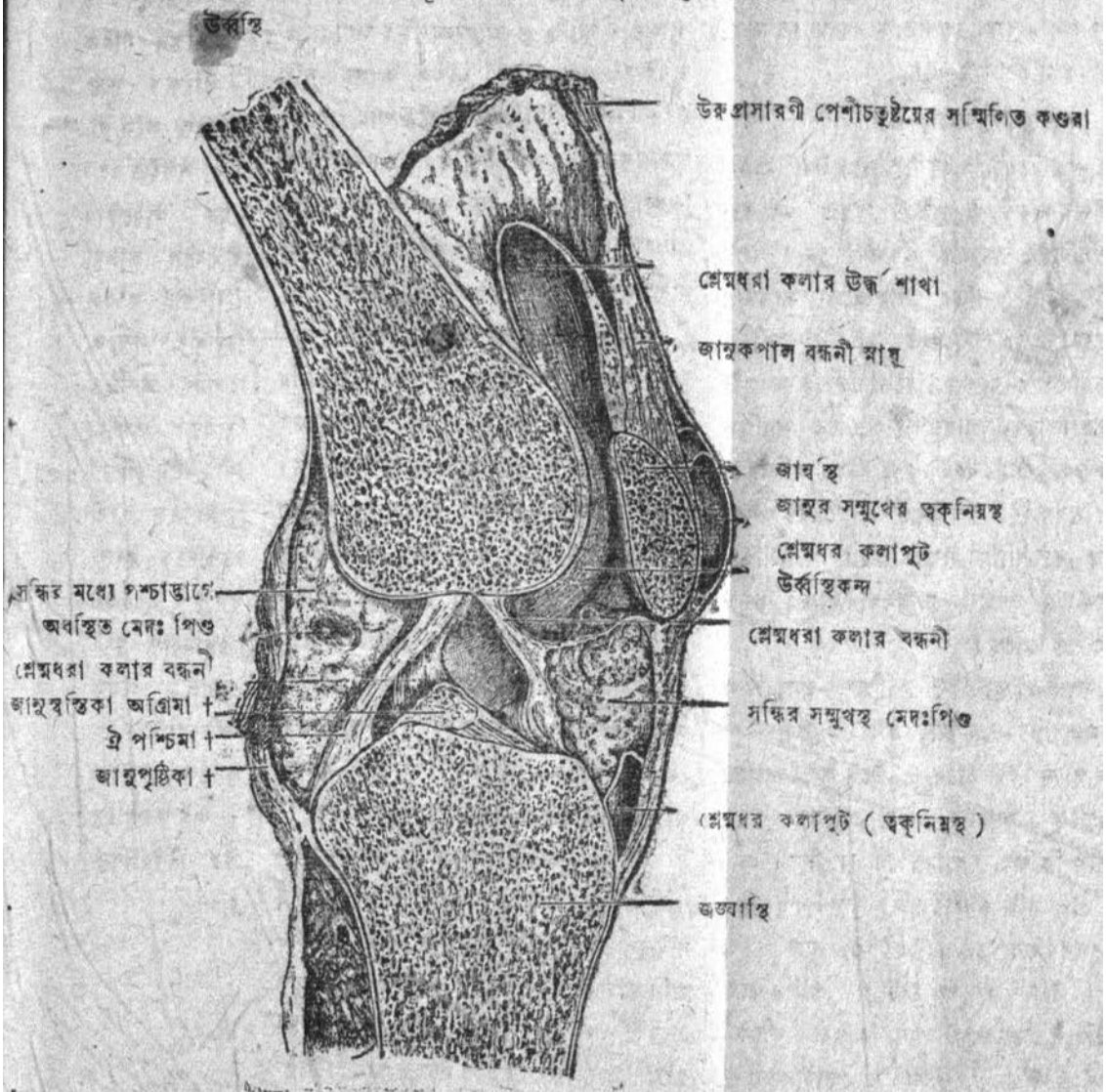

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

চেষ্টা—এই সন্ধি সঙ্কোচ ও প্রসার—এই দ্বিবিধ চেষ্টাযুক্ত, তন্মধ্যে সঙ্কোচ দ্বারা সক্থি পশ্চাদ্‌দিকে সম্পূর্ণভাবে মুড়িয়া যায় এবং প্রসার দ্বারা সম্মুখদিকে দণ্ডবৎ হয় মাত্র, তদধিক মুড়িয়া যায় না।

শ্লেষ্মধরা কলা—জানুসন্ধির শ্লেষ্মধরা কলা তিনটী; একটী 'সন্ধ্যন্তরীয়া মহতী'—ইহার একটী শাখা ঊর্দ্ধে বিস্তৃত এবং ইহা জানুসন্ধির মধ্যস্থ ও বিশালায়তন, অপর দুইটী শাখা সন্ধির বাহ্যদেশে সংসক্ত। তন্মধ্যে সন্ধির বহিঃস্থিত একটী কলাপুট জানুকপাল ও ত্বকের মধ্যে অবস্থিত। অপরটী জানুকপালবন্ধনী স্নায়ুরজ্জুর পশ্চাতে অবস্থিত ও কণ্ডরানুগা। মহতী কলা হইতে অতিরিক্ত শ্লেষ্ম ক্ষরণ হইয়া 'শিবামুণ্ড' বা 'ক্রোষ্টৃকশীর্ষ' নামক বাতব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সন্ধির সম্মুখে ও পশ্চাতে শ্লেষ্মধরাকলাচ্ছন্ন দুইটী মেদঃপিণ্ড আছে।

জঙ্ঘান্তরীয় সন্ধি—জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির সন্ধি ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য—এই তিন স্থানে হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধে অনুজঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্ত জঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধ প্রান্তের বহিঃসীমার কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ভাগে সংহিত হয়। ইহা প্রতরসন্ধি ও জানুসন্ধির সম্পূর্ণ বহির্ভূত। —কূর্পরসন্ধির তুলনায় এই বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। ঊর্ব্বস্থি-সংযুক্ত দুইটী স্নায়ু এই সন্ধিকে পার্শ্বদেশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অগ্রিমা, পশ্চিমা ও কোষাকারা—এই তিনটী স্নায়ুও উক্ত সন্ধির বন্ধন করে। অধোদিকে জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তের বহিঃসীমাস্থির ত্রিকোণাকার কোরে অনুজঙ্ঘাস্থির বহির্গুল্‌ফনিষ্পাদক অধঃপ্রান্ত সংহিত হইয়া কোরসন্ধি নির্ম্মাণ করে। অগ্রিমা, পশ্চিমা, বলয়িকা, ও সন্ধ্যন্তরীয়া নামে চারিটী স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন করিয়া থাকে। এইরূপে সংহিত জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তদ্বয়ের সহিত 'কূর্চ্চশির' নামক অস্থির সন্ধি হয়। এই সন্ধির বিষয় পরে বলা যাইবে। জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির মধ্যনলকদ্বয় 'জঙ্ঘান্তরালা' নামে দৃঢ় কলা দ্বারা সম্বদ্ধ। প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ন্যায় ইহাদেরও মধ্যনলকদ্বয়ের পরস্পর সংস্পর্শ হয় না।

গুল্‌ফসন্ধি বা পাদসন্ধি—জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের অধঃপ্রান্তের সহিত কূর্চ্চশির অস্থির খল্লকোর সন্ধি হয়—ইহা দুই গুল্‌ফের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে গুল্‌ফসন্ধি বলে। এই সন্ধি আশ্রয় করিয়া সমগ্র পদ সম্মুখে পশ্চাতে, ভিতরদিকে ও কিঞ্চিৎ বাহিরদিকে বিবর্ত্তিত হইতে পারে। এইজন্য ইহাকে পাদসন্ধিও বলা যায়। অগ্রিমা, পশ্চিমা, অন্তঃপার্শ্বিকা ও বহিঃপার্শ্বিকা নামে চারিটী স্নায়ু জঙ্ঘাস্থি, অনুজঙ্ঘাস্থি, কূর্চ্চশির, নৌনিভ, পার্ষ্ণি—এই কয়টি অস্থিতে সংসক্ত থাকিয়া এই সন্ধির বন্ধনকার্য্য নিষ্পন্ন করে।

পাদকূর্চ্চাস্থির সন্ধি—পাদকূর্চ্চাস্থি সমূহের মধ্যে কোন্‌টী কাহার সহিত সন্ধিযুক্ত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অনেকগুলি স্নায়ু ঐ সকল অস্থির বন্ধন করিয়া থাকে এবং ঐ সকল স্নায়ু পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া এইরূপ স্নায়ুজালবেষ্টিত ও দৃঢ়বদ্ধ পাদকূর্চ্চাস্থিসমূহ করকূর্চ্চাস্থির মত একখানি অস্থি বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য প্রাচীনেরা কেহ কেহ প্রত্যেক পদে একখানি করিয়া 'শলাকাধিষ্ঠান' অস্থি আছে বলিয়াছেন।

পাদতল সন্ধি—পাদতলের পশ্চার্দ্ধে অবস্থিত কূর্চ্চাস্থিসন্ধির বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পাদতলের সম্মুখার্দ্ধে পাদমূলশাফাগুলির সম্মুখে ও পশ্চাতে কোরসন্ধি হইয়া থাকে। ইহাদের সন্ধান তিনপ্রকার—সম্মুখে পাদাঙ্গুলিসমূহের পশ্চিমনলকগুলির সহিত, পশ্চাতে কোণকত্রয় ও ঘননামক কূর্চ্চাস্থির সহিত এবং মূলদেশে পরস্পরের সহিত। তন্মধ্যে পাদাঙ্গুলির পশ্চিম নলকের সহিত সন্ধি অঙ্গুলির সন্ধির ন্যায়। কূর্চ্চাস্থিগুলির সহিত সন্ধি পাদতলগত, পাদপৃষ্ঠগত এবং সন্ধ্যন্তরীয়—এই তিন প্রকার স্নায়ু দ্বারা সম্বদ্ধ হয়।

অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য মূলশলাকাগুলি মূলদেশে পরস্পর সংসক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎ ত্রিবিধ স্নায়ু দ্বারা সন্ধি বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয়।

পাদাঙ্গুলি সন্ধি—করাঙ্গুলির ন্যায় পাদাঙ্গুলি সমূহের চৌদ্দটী কোরসন্ধি আছে—অঙ্গুষ্ঠে দুইটি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলীতে তিনটি করিয়া বারটি। ইহাদের বন্ধনী স্নায়ুগুলিও করাঙ্গুলিসন্ধির ন্যায়।

[৪৭শ চিত্র—পাদ সন্ধি বা গুল্‌ফ সন্ধি]

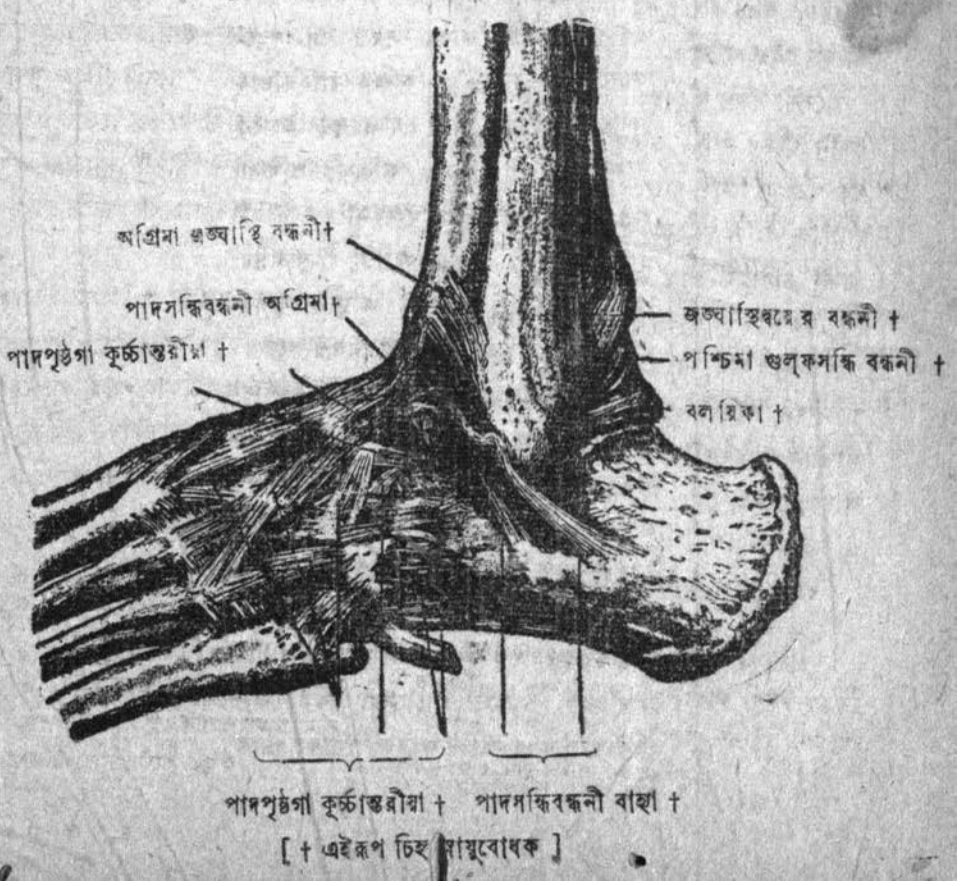

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

চেষ্টা—পাদঙ্গুলি সকলের চেষ্টা বা চলত্ব অল্পমাত্র—সঙ্কোচন, প্রসারণ, অন্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণ—এই চারিপ্রকার চেষ্টাই অল্প-ভাবে বর্ত্তমান।

পেশী পরিচয়।

পূর্ব্বে নরকঙ্কাল বর্ণন প্রসঙ্গে যে অস্থিময় শরীরের বিষয় বলা হইয়াছে, উহা সর্ব্বত্র পেশী দ্বারা আবৃত থাকে এবং পেশী সকল দ্বিবিধ কলা ও ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। অর্থাৎ শরীরের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর দিকে প্রথমতঃ ত্বক্, তৎপরে মেদোধরা কলা, পরে মাংসধরা কলা, তৎপরে স্তরে স্তরে পেশী সমূহ এবং তৎপরে অস্থি অবস্থিত। পেশী সমূহের দ্বারা শরীরের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সাধিত হইয়া থাকে।

পেশী সকল মাংসময়। মাংস ও পেশীর কোন প্রভেদ নাই। চলিত কথায় পেশীগুলি খণ্ড খণ্ড করিলেই মাংস বলা হয়। পেশীর আকার প্রায় স্থূলমধ্য রজ্জুর ন্যায়, কচিৎ মোটা চাদরের ন্যায় এবং হৃদয়াদি স্থানে কোষের ন্যায়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে পেশী সকল সন্ধি, অস্থি, সিরা ও স্নায়ু সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং স্থানভেদে আবশ্যক মত কঠিন, কোমল, স্থূল, সূক্ষ্ম, আয়ত, গোল, হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থির, মৃদু, মসৃণ ও কর্কশ হয়। *

রজ্জুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট পেশীসমূহের শুভ্র মসৃণ, দৃঢ় ও স্নায়ুময় প্রান্তভাগকে কণ্ডরা † বলে। বিস্তৃত ও স্থূল পেশী সকলের প্রচ্ছদাকার অর্থাৎ চাদরের ন্যায় আয়ত প্রান্ত-ভাগগুলির কলা ও কণ্ডরা উভয়ের সহিত সাদৃশ্য আছে, এজন্য উহাদিগকে 'কলাকণ্ডরা' ‡ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়।

শাখাসমূহের পেশীগুলি পরস্পরসহ ঘন-ভাবে সন্নিহিত। উভয়ের মধ্যে কেবল খুব পাতলা কলার ব্যবধান আছে মাত্র। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেশী পৃথকভাবেও কলাদ্বারা বেষ্টিত, আবার সবগুলি একত্র একটী কলা দ্বারা বেষ্টিত।

প্রধানতঃ পেশীসকলকে আশ্রয় করিয়া সিরা, ধমনী ও স্রোতঃসমূহের শাখা প্রশাখা সমূহ মাংসাদির মধ্যে প্রসারিত হয়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে "পঙ্কোদকস্থিত মৃণাল যেমন ভূমিতে চতুর্দ্দিকে তন্তু বিস্তার করিয়া থাকে, সিরা ধমনী প্রভৃতিও মাংসের মধ্যে সেইরূপ শাখা প্রশাখাদ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। §

পেশী সকলের সঙ্কোচ ও প্রসার বশতঃ অবয়ব সমূহের আকর্ষণ, প্রসারণ, উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক চেষ্টা সাধিত হইয়া থাকে। চেষ্টার বেগপ্রবৃত্তি পেশীর মধ্যে প্রবিষ্ট চেষ্টাবহা নাড়ী সকলের

* তাসাং বহল-পেলব-স্থূলাণু-পৃথু-বৃত্ত-হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্থির-মৃদু-শ্লক্ষ্ণ-কর্কশ ভাবাঃ সন্ধ্যস্থি-সিরা-স্নায়ু-প্রচ্ছাদাকা যথা-দেশং স্বভাবত এব ভবন্তি

সুশ্রুত, শারীর স্থান, ৫ অঃ।

† ইং—নাম Tendon (টেণ্ডন)।

‡ ইং নাম—Apponeurosls—(এপো-নিউরোসিন)।

§ যথা বিসস্থণালানি বিবর্দ্ধন্তে সমন্ততঃ।
ভূমৌ পঙ্কোদকস্থানি তথা মাংসে সিরাদয়ঃ॥

সুশ্রুত, শারীর স্থানে ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বারা ঘটে। শারীরিক বলও পেশীমূলক। পেশী সকল সুপুষ্ট ও সুসংহত হইলেই লোককে বলবান বলা হয়।

চেষ্টাবহা ব্যতীত সংজ্ঞাবহা নাড়ীও পেশীর মধ্যে অবস্থিতি করে। এই সকল নাড়ী দ্বারা পেশী সমূহের সঙ্কোচপ্রসার জনিত স্পর্শ সজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ক্রিয়ার বিশেষত্ব বশতঃ পেশীসকল 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'—এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে স্বতন্ত্র পেশী সকলের ক্রিয়া আপনা হইতে হইয়া থাকে, পুরুষের ইচ্ছার অপেক্ষা করে না—যেমন হৃদয়, আমাশয় প্রভৃতি স্থানের পেশীগুলি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল। পরতন্ত্র পেশীসকল পুরুষের ইচ্ছাবশে চালিত হইয়া থাকে, যেমন কর চরণাদি স্থানের পেশী। এই জন্য ইহাদিগের অপর নাম—"ইচ্ছাধীন" পেশী।

ইচ্ছাধীন পেশী সমূহের উভয়প্রান্ত প্রধানতঃ স্নায়ুময়। উহারা উভয়দিকেই অস্থিতে সংবদ্ধ, কচিৎ একদিকে অস্থিতে ও অপরদিকে ত্বকে অথবা একদিকে অস্থিতে ও অপর দিকে স্নায়ুতে সংবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধদিকের নিবন্ধন প্রায়ই স্থিরতর ও 'প্রভব' নামে অভিহিত এবং নিম্নের নিবন্ধন অধিক ক্রিয়াশীল ও 'নিবেশ' নামে কথিত।

পেশী সকলের উপাদান—জলৌকা শরীরের ন্যায় সঙ্কোচ প্রসারশীল মাংসতন্তুগুচ্ছ এবং অল্প সংখ্যক স্নায়ুসূত্র। গুচ্ছীভূত মাংসতন্তু সমূহই পেশী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পরতন্ত্র পেশীসমূহের মাংসতন্তুগুলি চওড়াদিকে রেখাঙ্কিত, দীর্ঘ এবং নাতিঘন সংঘাত বিশিষ্ট; আর স্বতন্ত্র পেশীসমূহের মাংসতন্তুগুলি ঐরূপ রেখাবিহীন, হ্রস্ব এবং ঘনসংঘাত বিশিষ্ট। স্বতন্ত্র পেশী সকলের উৎপত্তি বা নিবেশ অস্থিসাপেক্ষ নহে—উহারা প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থিতি করে।

সিরাধমনীজালকনিঃসৃত রক্তের 'লসীকা' নামক স্বচ্ছ জলীয় ভাগের দ্বারা পেশী সকলের পোষণ হয়।

প্রাণীর প্রাণবিয়োগ হইলে পেশী সকল প্রথমে শীঘ্রই সঙ্কুচিত ও কঠিন হইয়া যায়, এই কারণে মৃতদেহে হস্তপদাদির কঠিনতা ঘটে। ইহাকে 'মৃতিকাঠিন্য' (Rigor Mortis) বলে। ইহা অপগত হইলে পেশী সকল পচিতে আরম্ভ হয়।

পেশী সকলের নামকরণ নানাবিধ সূত্র ধরিয়া করা হয়। কখন স্থান ভেদে যেমন 'গ্রীবাপৃষ্ঠিকা' পেশী, কখন উৎপত্তি-নিবেশ ভেদে—যেমন 'উরঃকর্ণমূলিকা' পেশী কখন কার্য্য ভেদে—যেমন 'অঙ্গুষ্ঠপ্রসারিণী' পেশী, কখন আকৃতি ভেদে—যেমন 'দ্বিশিরস্কা' পেশী, কখন যদৃচ্ছাক্রমে—যেমন 'মন্থা'—ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদকারগণের মতে পেশীর সংখ্যা পাঁচশত*। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যে ও কেহ কেহ পেশীর সংখ্যা ৫০১ পাঁচশত

---

* Sappey recogninses 501 muscles distributed as follows :—trunk, 190 ; head 63 ; arms, 98 ; legs 104 ; and alimenlary canal 46. G. D, Thane finds 311 muscles on cach side of the body :—head and front of neck, 82 ; Vertebral colunm and back of neck, 60 ; thorax, 42 ; abdomen, 14 ; arm 59 ; leg, 54, (Morris's Anatomy p. 317.)

এক বলিয়াছেন †। পেশীর সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ কথঞ্চিৎ মতের ঐক্য পেশী সমষ্টি সম্বন্ধে মাত্র—ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের পেশী সংখ্যা সম্বন্ধে নহে। উদাহরণ যথা—সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, শাখাসমূহ পেশীর সংখ্যা চারি শত, কিন্তু নব্য মতে শাখাসমূহের পেশীর সংখ্যা দুই শত মাত্র।

এইরূপ মতভেদ গণনার পার্থক্য বশতঃ ঘটিয়া থাকে। যেমন প্রতীচ্যমতে অঙ্গুলি প্রসারণী ও সঙ্কোচনী পেশীগুলি বহুশাখা বিশিষ্ট হইলেও সংখ্যায় অনেকগুলি বলিয়া ধরা হয় না, এক একটী মূল ধরিয়া এক একটী পেশী ধরা হয়। সম্ভবতঃ প্রাচ্যমতে ইহাদের নিবেশ ও পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াশীলতা ধরিয়া শাখাগুলির পৃথক্ গণনা করা হইয়াছে। এইরূপ পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা পেশীকে প্রাচ্যমতে দুইদিকে স্বতন্ত্র পেশী বলিয়া গণনা করা হয়, কিন্তু প্রতীচ্য মতে উভয় দিকের অংশ একত্র ধরিয়া একটী পেশী বলিয়া গণনা করা হয়। প্রাচ্যমতের সংখ্যামাত্র সুশ্রুতাদিতে পাওয়া যায়, পৃথক্‌ভাবে বিশেষ বর্ণনার গ্রন্থসমূহ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। এইজন্য প্রাচ্যমতের সম্পূর্ণ অনুসরণ এক্ষণে অসম্ভব।

† পঞ্চ পেশীশতানি ভবন্তি। তাসাং চত্বারিংশতানি শাখাসু, কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টিঃ, গ্রীবাং প্রত্যর্দ্ধং চতুস্ত্রিংশৎ।
(সুশ্রুত, শারীরস্থান ৫ অঃ।)

অতএব এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচ্য মতের অনুসরণ না করিয়া প্রতীচ্যমতানুসারে পেশী সমূহের বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম।

পেশী বর্ণনা।

প্রথমে মস্তক ও গ্রীবার পেশী সমূহের বর্ণনা করা যাইতেছে। তন্মধ্যে মস্তক ও মুখমণ্ডলের পেশীগুলিকে বর্ণনা-সৌকার্য্যার্থ দশটী স্থানে বিভক্ত করা যায়। যথা, করোটি-পটলে একটী, প্রতিকর্ণের চতুর্দ্দিকে তিনটী, প্রতি ভ্রূতে তিনটী, প্রতি নেত্রগোলকে সাতটী, নাসাপার্শ্বে সাতটি, ঊর্দ্ধহনুর এক এক দিকে চারিটী, অধোহনুর এক এক দিকে তিনটী, হনুদ্বয়ের মধ্যে এক এক দিকে তিনটী, শঙ্খ ও হনুর মধ্যস্থলে এক একদিকে দুইটী হনুমূলে এক এক দিকে দুইটী।

করোটিপটলস্থিত পেশীর নাম **শিরশ্ছদ্মা**। উহা ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাৎ কপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মধ্যে স্থূলকলা নির্ম্মিত। শিরশ্ছদা পেশী ললাটসঙ্কোচন ও মস্তক আচ্ছাদন—প্রধানতঃ এই দুইটী কার্য্য করিয়া থাকে।

[৪৮শ চিত্র—মস্তকের পেশীসমূহ]

(উপরিস্থ স্তর)

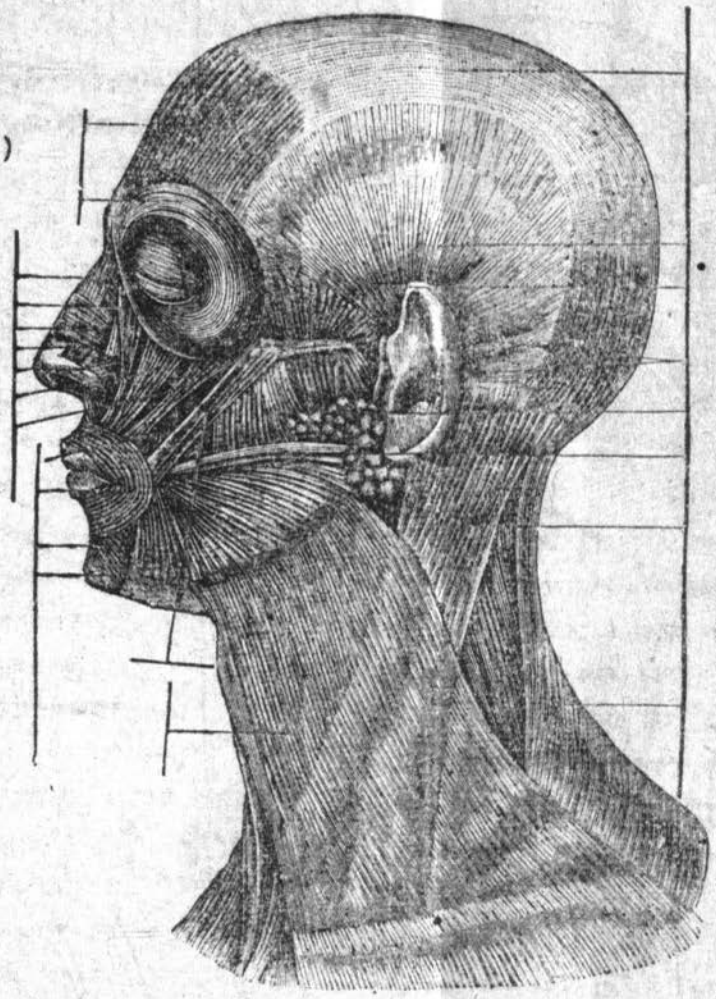

শিরশ্ছদা (অগ্রিমাংশ)
নেত্রনিমীলনী
ভ্রূ সংনমনী
নাসৌষ্ঠকর্ষণ
নাসাসেতুকা
নাসাবিস্ফারণী পূর্ব্বা
নাসাবিস্ফারণী পশ্চিমা
ওষ্ঠ সমুৎকর্ষণী লঘ্বী
সৃক্কণী কর্ষণী পশ্চিমা
মুখমুদ্রণী
অধরোৎক্ষেপণী
অধরাবনমনী
সৃক্কণীকর্ষণী গুর্ব্বী
গলপার্শ্বচ্ছদা

শিরশ্ছদাপেশীরমধ্যস্থ
কলাময় অংশ
কর্ণোন্নমনী
কর্ণপূর্ত্তিকা
—শিরশ্ছদা (পশ্চিমাংশ)
কর্ণপৃষ্ঠিকা
হনুকূটকর্ষণী
হসনিকা
উরঃ কর্ণমূলিকা
পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা

আয়ুর্ব্বেদ—অনুশীলন।

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী)

—•—

যে শাস্ত্র আজ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াও রোগ ও ঔষধ রাজ্যে মানবের প্রকৃত বা সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মাইতে পারিতেছে না, তাহার সামান্য আভাসে কি হইবে? উক্ত সামান্য আভাসই বা কোথা হইতে আসিল, কেইবা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা, ঐ আভাস পরম্পরা হইতে কোন্ কৌশলেই বা এই বিশ্বব্যাপক শাস্ত্রের উদ্ভব হইল, আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মাত্রেরই এই রহস্য জানিবার কৌতূহল জন্মিতে পারে।

কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র কেন, যে কোন বিষয়ই কেন হউক না,মানবের সেই অন্ধকারময় আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে সকলের হৃদয় বিস্ময় রসে প্লাবিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয় আজ একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুও সরল বলিয়া বুঝিতে পারে, প্রথমাবস্থায় তাহা সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞাত ছিল। আজ যাহা নগণ্য আবিষ্কার বলিয়া প্রতীত; তাহাতেও এক সময় মানব বুদ্ধি চমকিত হইয়াছিল, জয়নাদে গগন বিদীর্ণ হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে ঐ সকল এক দিনের এক মাসের বা এক বৎসরের সংগ্রহ নয়। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, বহু দর্শন বহু চিন্তা বহু পরীক্ষার ঝড় মানবজীবন ব্যয়িত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এক ব্যক্তি কোনো বিষয়ের আভাস মাত্র পাইলেন, সেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সেই বিষয়ের উপদেশ দিলেন, এইরূপ উপদেশ-পরম্পরাক্রমে শাস্ত্র মাত্রেরই শিক্ষা বলিয়া আসিতেছে। বেদের সময়ে, পুরাণের সময়ে এবং তন্ত্রের সময়ে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাগত কোন প্রভেদ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, অথবা শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রণালী কিরূপ, এবং প্রকৃত চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক তাঁহাদিগের কতদূর লক্ষ্য—তদ্বিষয় আমরা সংক্ষেপে—কিছু কিছু আলোচনা করিব।

এ বিষয়ের আলোচনায় ফল কি? তাহা পাঠকগণ স্বয়ং বুঝিয়া লইবেন। শিক্ষা বলিলে কি বুঝায় এবং শিক্ষার গুণ কি ইহা বলা অনাবশ্যক। কেননা শিক্ষার স্রোতের পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং শিক্ষার প্রভাবও সাধারণে অবগত হইতেছেন। পরন্তু শিক্ষার সহিত চিকিৎসার অনেক অংশে সাদৃশ্য বা সাম্য আছে ইহা হয়ত সাধারণে না জানিতে পারেন।

চিকিৎসার যেমন চিকিৎসক, ঔষধ দ্রব্য পরিচারক ও রোগী এই চারিটী পাদ বা অঙ্গ বলিয়া গণ্য, এই কারণেই চিকিৎসককে—"চতুষ্পাদ বা চতুরঙ্গ বলে।" (১)

* ভিষকদ্রব্যানুপস্থাতা রোগীপাদ চতুষ্টয়ম্।
গুণবৎকারণং জ্ঞেয়ং বিকারমুপশান্তয়ে॥
(চরক)(১)

শিক্ষারও তেমনি শিক্ষক, গ্রন্থ, অভিভাবক ও শিষ্য এই চারিটিকে পাদ বা অঙ্গ বলা যাইতে পারে। কেন না উহাদের কোনটীর অভাবে চিকিৎসা চলিতে পারে না। এবং উহাদের গুণ-দোষের উপর চিকিৎসা বা শিক্ষার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। চিকিৎসা পাদের সহিত শিক্ষাপাদের নিম্নলিখিত সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

"চিকিৎসা পাদ—" (২)

"চিকিৎসক"—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ দৃষ্টকর্ম্মা, স্বয়ংকৃতী, ক্ষিপ্রহস্ত, শুচি, শূর, চিকিৎসোপযুক্ত সজ্জা ও উপকরণ যুক্ত প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্যধর্ম্মপরায়ণ।

ঔষধ—প্রশস্ত দেশসম্ভূত প্রশস্ত দিনোদ্ভূত মাত্রোচিত, মনোহার গন্ধবর্ণ রসান্বিত, দোষঘ্ন, অগ্লানিকর।

পরিচারক—স্নেহবান্ অনিন্দুক বলবান, রোগীরক্ষণতৎপর, বৈদ্যবাক্য প্রতিপালক, শ্রমশীল।

রোগী—আয়ুষ্মান্, ক্লেশসহিষ্ণু, সর্ব্ব দ্রব্য নির্লোভ, আস্তিক, বৈদ্যবাক্য প্রতিপালনকারী।

শিক্ষাপাদ—

শিক্ষক—শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ, দৃষ্টকর্ম্মা, অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা শুচি, শূর শিষ্যোপযুক্ত উপকরণ সম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্ উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্য ধর্ম্মপরায়ণ।

গ্রন্থ—সুলেখনী প্রসূত-সুসময় লিখিত শিষ্যের ধারণ যোগ্য মনোহারী রস কাব্যাদিগুণ সমন্বিত চরিত্র সংশোধক, সন্তোষদায়ক, অনপকারী।

অভিভাষক—স্নেহবান্, অনিন্দুক, বলবান্ ছাত্রশাসনপটু শিক্ষক।

শিষ্য—আয়ুষ্মান, ক্লেশসহিষ্ণু, উপদেশ গ্রহণক্ষম, গ্রন্থায়ত্তকরণ সম্পন্ন, নির্লোভ আস্তিক, শিক্ষকোপদেশানুরাগী।

রোগীর রোগ মোচন করিয়া সুনির্ম্মল স্বাস্থ্য সুখ বিতরণ করা যেমন চিকিৎসকের কার্য্য, শিষ্যের মনোমালিন্য দূর করিয়া প্রকৃত জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া দেওয়াও শিক্ষকের তেমনি কর্ত্তব্য। রোগ পরীক্ষার জন্য রোগীর বাহ্য বা অভ্যন্তর দেশ উন্নত করিয়া পরীক্ষা করা যেমন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শিষ্যের অন্তঃকরণ কিরূপ কুসংস্কারাদিতে আচ্ছন্ন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার পঠনের সহিত তাহার মানসিক বৃত্তিনিচয় নূতন ভাবে পরীক্ষা করাও শিক্ষকের তেমনই কর্ত্তব্য। রোগীর প্রকৃত বয়স ইত্যাদির সহিত দেশকাল প্রভৃতির সামঞ্জস্য করিয়া মাত্রাতে ঔষধ প্রয়োগ করা যেমন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, শিষ্যেরও মানসিক

---

(২) তত্রাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মাস্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃশূরঃ সদ্ভোপকরণ ভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ম্বদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে।
প্রশস্ত দেশেসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণ রসান্বিতং॥
দোষঘ্নমগ্লানিকরং মধিকং ন বিকারি যৎ।
সমীক্ষ্য কালেদত্তঞ্চ ভেষজং স্যাদ্ গুণাবহম্॥
সিদ্ধো হস্তস্পৃগ্বলবান যুক্তো ব্যাধিত রক্ষণে
বৈদ্যবাক্য কৃদশাস্ত্রং পাদ পরিচয় স্মৃতঃ।
আঢ্যমান বত্ত্ববান সাধ্যো দ্রব্যবানাস্য বসানি
আস্তিক বৈদ্যবাক্যস্থো ব্যাধিতঃ পাদ উচ্যতে॥

প্রবৃত্তি, মনের গঠন কিরূপ, কোন্ বৃত্তি প্রবল, কোন্ বৃত্তি অপ্রবল, মেধা কেমন, বুদ্ধি কেমন, মনের ভাবাশক্তির কোন দিকে কোন বিষয় শিক্ষার সমস্যা ফলোপদায়ক হইতে পারে, ইত্যাদি মনের স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা বা গতি, বয়স প্রভৃতি বিচার করিয়া দেশ কাল ইত্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক যথোচিত শিক্ষা প্রদান করাও শিক্ষকের কর্ত্তব্য, নতুবা শিক্ষা সুসিদ্ধ বা সুফলপ্রদ হইতে পারে না। রুগ্ন ভগ্ন জীর্ণ দেহ সংস্কার এবং মুমূর্ষ জীবনের পুনরানয়নরূপে উৎকৃষ্ট কার্য্য সাধন করেন বলিয়া চিকিৎসক যেমন জীবনদাতা পিতা, অজ্ঞান তিমিরান্ধ বিমূঢ় ব্যক্তির আত্মসংস্কার এবং জ্ঞানলোক বিতরণ করেন বলিয়া শিক্ষকও তেমনি জ্ঞানদাতা পিতা। একটু আধটু তিক্ত প্রভৃতি ঔষধ রোগীর রুচিকর হয় না বলিয়া চিকিৎসককে সময় সময় কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, আপাত অপ্রীতিকর দুর্গম জটিল বিষয় সকল অরুচিকর হয় বলিয়া শিক্ষককেও সময় সময় উপন্যাস ও রূপক প্রভৃতি নানাবিধ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। ফলতঃ চিকিৎসা যেমন দুরূহ, শিক্ষাও তেমনি দুরূহ। এই কারণে প্রকৃত চিকিৎসক যেমন দুর্লভ, প্রকৃত শিক্ষক তেমনি দুর্লভ। এইরূপ শিক্ষক দুর্লভ বলিয়া শিক্ষাকুশল নীতিনিপুণ কবি বলিয়াছেন,—

"যেমন জলাশয় দুরারোহ হইলেও কেহ যদি সোপান করিয়া দেন, তবে তাহাতে অবগাহন করা যাইতে পারে, তেমনি ছাত্র দুর্ব্বোধ হইলেও কেহ যদি সোপান অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি করিয়া দেন—তাহা হইলে তাহাতে প্রবেশ করা যাইতে পারে।" কিন্তু সুন্দর সোপান প্রভৃতি করিয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়াই ভার।

চিকিৎসার সহিত শিক্ষার এইরূপ সাদৃশ্য প্রদর্শন প্রকৃত প্রস্তাবে সমীচীন। এইরূপ সাদৃশ্য প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা চিকিৎসার্থী বা চিকিৎসার উৎকর্ষাভিলাষী, তাঁহাদের যেমন চিকিৎসক, ঔষধ, ও পরিচারক ও রোগী এই চারিটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, এই চারিটীর উৎকর্ষ বিধানে অনুশীল হওয়া উচিত, তেমনি যাঁহারা শিক্ষার্থী বা শিক্ষার উন্নতিকামী, তাঁহাদিগেরও শিক্ষক, শিষ্য প্রভৃতি চারিটীর অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাদিগের একটী দ্বারায় কখনও শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না। যে কার্য্য পরস্পর যোগসাপেক্ষ, সে কার্য্যের প্রত্যেক অঙ্গের সে বোধ-বিচার করা বিধেয়। যে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রসারে আমরা এই সকল কথা উত্থাপন করিলাম, বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, সেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার সমস্ত অঙ্গেরই অভাব। সেই সকল অভাব মোচন না করিয়া যাহারা কেবল উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত তাঁহাদিগের কথা লইয়া আলোচনা করা আমরা বাস্তবিকই প্রয়োজন মনে করি না।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার]

প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যা।

তৃণ, অঙ্গার, (ছাই বা তামাকের গুল) প্রস্তর, বালুকা, লৌহ, চর্ম্ম-লোম (tooth brush) প্রভৃতি নিতান্ত অব্যবস্থিত দ্রব্যে দন্তধাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সুব্যবস্থিত উপকরণে দন্তধাবন করিয়া মুখগহ্বর পবিত্র করিবে। তৎপর হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া শুচি হইবে। ঈদৃশ শুচি ব্যক্তিকে দেবতাগণ রক্ষা করিয়া থাকেন। পিতৃগণ শুচি ব্যক্তির অনুগত হন। রোগ-বীজরূপ রাক্ষসগণ শুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। শৌচভ্রষ্ট ব্যক্তি স্নান, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মন্ত্র, জপ, ধর্ম্ম এবং বিধিবোধিতক্রিয়া ও মঙ্গলাচার প্রভৃতির ফল কিছুমাত্র লাভ করে না। এ নিমিত্ত নিরন্তর নানাবিধ রোগ-শোকাদির অধীন হইয়া থাকে।

উক্তরূপে শৌচক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তির প্রাতঃস্নান সহ্য হয় না, তাঁহারাই সংক্ষেপে প্রাতঃস্নান করিবেন বলিয়া রাত্রিবাস তৎকালে পরিত্যাগ করিবেন। রাত্রি বাস পরিত্যাগ, হস্তপদাদি প্রক্ষালন, মস্তকে গঙ্গোদক—অভাবে তুলসীযুক্ত জল প্রক্ষেপ করতঃ অগ্রে গাত্র মার্জ্জনী দ্বারা আপাদ মস্তক মার্জ্জন করাকে সংক্ষেপ প্রাতঃস্নান কহে। এতদ্বারা শারীরিক বাহ্যক্লেদাদি বিদূরিত হইয়া দেহ পবিত্র, হর্ষযুক্ত এবং বিমল হইয়া দেহের জড়তা বিদূরিত হয়। প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগান্তে হস্তপদ প্রক্ষালনেও উক্ত প্রকার সুফল হইয়া থাকে। অরোগ এবং সহিষ্ণু ব্যক্তি উক্তরূপে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শৌচকার্য্য সমাধা করিয়াই নদ্যাদিতে সমন্ত্র এবং গৃহে হইলে অমন্ত্র প্রাতঃস্নান করিবে। প্রাতঃস্নান স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অমৃত তুল্য। প্রাতঃস্নানে দেহ রোগশূন্য পবিত্র ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ হয়। প্রাতঃস্নান সদ্যঃ পাপহর, সদ্যঃ দুঃখবিনাশক, সুখপ্রদ। প্রাতঃস্নানাভ্যাসীগণ প্রায়শঃই মহামারী-জীবাণু বা ম্যালেরিয়ার জীবাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন না। অতএব প্রাতঃস্নান সহপূর্ব্বক অভ্যাস করা সকলের পক্ষেই নিতান্ত মঙ্গলজনক। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হওয়া আবশ্যক। প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যা-বন্দনার উপকারিতা আধুনিক নব্যশিক্ষিতগণ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া দেশব্যাপী নিত্য নূতন রোগ-শোকের প্রাদুর্ভাব দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং শৌচ-সদাচার ও প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনা পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই পূর্ব্বকালের ব্যক্তিগণ সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু ও নীরোগ এবং নিরন্তর

উৎসাহ সম্পন্ন থাকিতেন। উক্তরূপ সদাচার বিহীনতাই বর্ত্তমান কালের স্বাস্থ্যবিহীনতার অন্যতম কারণ। এ নিমিত্ত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং ভাবী সদ্বংশোৎপাদনকামী ব্যক্তি মাত্রেরই আর পাশ্চাত্য অনাচার-তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া না থাকিয়া প্রাচ্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অনুশীলনে ভক্তিবান হওয়া এবং তত্তদাচার অভ্যাস করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রাচ্য বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কোন সদুপদেশ শ্রবণমাত্রেই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তগণ "ইহা কেন করিব; উহা কেন করিব?" ইত্যাদি "কেন" লইয়া উন্মত্ত থাকেন; এবং কথায় কথায় "হাইড্রোজেন, অক্সিজেন" ঘটিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝিয়া লইবার দাবী করেন, সেই দাবীগুলি ভুলিয়া শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক যথাসাধ্য শাস্ত্রাদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ স্থূলজ্ঞানসম্পন্ন পাশ্চাত্য বিদ্যালাভ করিয়া কথায় কথায় "কেন"র সপিণ্ডকরণ এতকাল পর্য্যন্ত করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাতে সে "কেন"র সদুত্তর প্রাপ্ত না হওয়ায় তত্তদাচার অনুষ্ঠিত হয় নাই। সেই অনাচারে পরিচালিত হইয়া তাহার কুফল যখন যথেষ্ট উপভোগ করা হইল, যাহার ফলে আজ পল্লী, নগর শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, এমন অবস্থায় এখন একবার "কেন"র প্রলাপ ছাড়িয়া দিয়া অন্ধবৎ আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং তদাদিষ্ট অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিয়া কিছুদিন স্বাস্থ্যচর্য্যা করিয়া দেখার হানি কি?

প্রাতঃস্নানার্থী ব্যক্তি সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত পূর্ব্বদিককে অবলোকন পূর্ব্বক কর্ণদ্বয় মধ্যে তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া বক্ষনিমজ্জিত জলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে। প্রত্যহ নদী বা পুষ্করিণী, বাপী বা প্রস্রবণে স্নান করাই প্রশস্ত। অধিকক্ষণ স্নান করিবে না। অনভ্যাসীগণ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে নিত্য প্রাতঃস্নান অভ্যাস আরম্ভ করিবেন। স্নানান্তে গঙ্গা স্তোত্রপাঠ ও প্রণাম করিবে। গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বল পূর্ব্বক দৃঢ় ভাবে গাত্র মার্জ্জনা করিলে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া সুচারু হইবার সাহায্য লাভ করিবে। অনন্তর আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৌত পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করতঃ গঙ্গামৃত্তিকা অথবা তিলক দ্বারা যথাবিহিত নিয়মে তিলক ধারণ করিবে। তিলক ধারণ পরম পবিত্র কর্ম্ম। তিলক-ধারী ব্যক্তি পরম বৈষ্ণব স্বরূপ। অনন্তর পিতৃতর্পণ করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন হয়। পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হইলে তদ্বংশজাত ব্যক্তিগণ সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেহে দীর্ঘায়ু থাকিতে পারেন। তিলক ধারণ ব্যতীত গোদান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণাদি কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। উক্ত কর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধপুণ্ড ধারণ করিতে হইবে। মৃত্তিকাদির অভাব হইলে জল দ্বারায়ও ঊর্দ্ধপুণ্ড করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা বা দেবাদির অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। তিলক ধারণে অঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার পুষ্টিবৃদ্ধিকরী, মধ্যমা আয়ুর্বৃদ্ধিকরী, অনামিকা অর্থপ্রদা, প্রদেশিনী মুক্তিদাত্রী হয়েন। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীর সম্ভূতা মৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করে, সে সূর্য্যরূপধারী হইয়া মোহ অন্ধকার নাশের নিমিত্ত হয়। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। দ্বিজগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড মৃত্তিকা দ্বারা বা হোমভস্ম দ্বারা

ত্রিপুণ্ড, আর যদৃচ্ছা প্রাপ্ত চন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড করিবেন, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড করিবেন, বৈশ্য অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ করিবেন, শূদ্র বর্ত্তুলাকার তিলক করিবেন। তিলক ধারণে ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধি হয়।

তিলক ধারণান্তর স্ব স্ব ধর্ম্মানুরূপ প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবেন। সন্ধ্যা বন্দনা এবং ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস—সর্ব্বরোগ আরোগ্যের মূল। সন্ধ্যাবন্দনা অন্তে মধ্যাহ্ন কালের পূজা অর্চ্চনার নিমিত্ত দূর্ব্বা চয়ণ কর্ত্তব্য। তাহাতে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ ও সুগন্ধ গ্রহণে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। অনন্তর কেশ-প্রসাদন, আদর্শ ও মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি দর্শন, তরল ঘৃতের মধ্যে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণের নিত্যকর্ম্ম জানিবেন। ইহলোকে মঙ্গল আটপ্রকার, যথা, ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন হিরণ্য, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা। ইহাদিগকে এবং যতিধর্ম্মীদিগকে দর্শন, স্পর্শন, এবং ভাষণ দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে মানবের দেহ মন পবিত্র হয়। বর্ত্তমান সময়ে যতিধর্ম্মীদিগের সংখ্যা নিতান্ত বিরল, এজন্য শুদ্ধাচার পরায়ণা বালবিধবাকে আমরা যতিধর্ম্মাবলম্বিনী মনে করিয়া লইতে পারি। বালবিধবাগণ সৎসঙ্গে সদাচার পরায়ণা থাকিলে তাঁহাদিগকে দেবী বা যতি বলিতে আপত্তি নাই। বৈধব্যধর্ম্ম যে পরম পবিত্র ধর্ম্ম,—তাহা আমরা বিগত ১৩১৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা আয়ুর্ব্বেদের ৩০৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি।

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শুক্র ধারণ, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্যবাক্য কথন, হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্পাপ অন্তঃকরণ, পরদ্রব্যে লোভ না করা প্রভৃতি মধুর ভাবে জীবন যাপনে কৃতসংকল্প হইয়া তদ্ভদাচার পরায়ণ হইতে পারিলেই স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল নিশ্চয় লাভ করা যায়। অতএব প্রভাতে উঠিয়াই সৎসংকল্প সকল লইয়া সমস্ত দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়া স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে কর্ত্তব্য। এইরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা করিলেই মানব ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। ধর্ম্ম রক্ষা হইলেই শরীর রক্ষা অনিবার্য্য। তাই শাস্ত্রে বলেন, "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্"। অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষিত হওয়াই শরীর রক্ষার মূল।

আমাদের দুই প্রকার ক্ষুধা হয়। দ্রব্যের কথা স্মরণ হইলে যে মানসিক লোভ বশতঃ খাইবার ইচ্ছা হয়, তাহাতে পাকাশয়ের খাদ্যের অভাব উপস্থিত হয় না। ইহাকে চক্ষুর ক্ষুধা বলে। আর প্রকৃত খাদ্যের প্রয়োজন বশতঃ যে ক্ষুধা হয় তাহাকেই প্রকৃত ক্ষুধা বলে। চক্ষুর ক্ষুধায় আহার করিলে অজীর্ণ হয়, সুতরাং তাহা কদাচ করিবে না। প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সর্ব্বকর্ম্ম সমাধা হইলে যদি কাহারো প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক হয় তবে তিনি অল্প পরিমাণ ছোলা ভিজা ও ইক্ষু গুড় ভোজন করিবেন। বিদেশীয় "চা" বিস্কুট, পাঁউরুটী প্রভৃতি দ্রব্য কদাচ আহার করিবেন না। তাহাতে অপকার ভিন্ন বিন্দুমাত্রও উপকারের সম্ভাবনা নাই। তবে ক্ষুধার আধিক্য স্থলে অল্প মাত্রায় হালুয়া ব্যবহারও এই অন্নগতপ্রাণ কলির জীবের পক্ষে চলিতে পারে। কিন্তু প্রাতঃক্রিয়া ও সন্ধ্যাদির পর উদর শূন্য থাকা কালে যাহার যতটুকু সহ্য হয়—সেই পরিমাণে দৈহিক ব্যায়াম

করা আবশ্যক। সে উদ্দেশ্যে কেহ বা "ডন্" কেহ বা কুস্তি, কেহ বা কোদালি দ্বারা মাটি কোদান, কুঠার দ্বারা লকড়ী প্রস্তুত প্রভৃতি গৃহস্থলীর সাহায্যকর পরিশ্রমও করিয়া লইতে পারেন। যে পরিমাণ পরিশ্রমে যাহার শরীর কথঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হয় তাহাই তাহার পক্ষে পরিমিতশ্রম। পরিমিত পরিশ্রম সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজন। তদ্বারা দেহ লঘু বোধ হয়, রক্ত সঞ্চালন সুচারু হয় এবং ক্ষুধা পরিবর্দ্ধিত এবং মন উৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে অপরিমিত পরিশ্রমে আবার ঐ সকল গুণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। পরিমিত পরিশ্রমের পর যথোপযুক্ত বিশ্রামান্তে প্রয়োজনানুসারে অল্প মাত্রায় লঘুপাক ও হিতকর বস্তু আহার করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার পর ভিন্ন আহারাদি করিতে অনিচ্ছুক বা অনভ্যস্ত তাঁহারা প্রাতঃকালীন ভোজন করিলে অসুস্থের কারণ হইবে। প্রাতঃকালীন ভোজনে "চা"র অপকারিতা বুঝিয়া উহা পরিত্যাগের চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইবেন। তৎপরিবর্ত্তে সদ্যঃদোহিত ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ সেবন পরমোপকারী। তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বর্ণকান্তিলাভ হইয়া থাকে। তদভাবে ঈষদুষ্ণ এক বলকের গব্যদুগ্ধও উপাদেয় পথ্য। বুটভিজা বা ইক্ষুগুড় প্রায় সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক হইতে পারে। একমুষ্টি চাউল সহ এক গ্লাস জলও অনেকে পান করিয়া থাকেন। ইহাও ক্ষুধার্থীদিগের পক্ষে মন্দ নহে। ফলতঃ নিতান্ত আবশ্যক হইলে প্রাতঃকালের ভোজ্য অতি অল্প মাত্রায় গ্রাহ্য হইতে পারে, নতুবা নহে।

উপযুক্ত সময়ে পরিমিত স্নান, মৌনাবলম্বন অর্থাৎ অতি অল্প বাক্য ব্যবহার, উপবাস, দৈবকার্য্য ও বেদাধ্যয়ন অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি পাঠ এই গুলিকে নিয়ম বলে। পূর্ব্বোক্ত ভাবে সাধ্যমত সংযম শিক্ষা করিয়া উক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সংযম প্রতিষেধ স্বরূপ, আর নিয়ম—অনুষ্ঠেয় রূপ। দিবসের প্রথম যাম অর্থাৎ চারি দণ্ড কালের মধ্যে উক্ত কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া দ্বিতীয় যামের জন্য প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাস বিহিত আছে। বেদাভ্যাস—ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এক কালে তপস্যা ছিল। এখন আর সেকাল নাই। পূর্ব্বকালে বেদ, বেদাঙ্গ ও স্মৃতি ভিন্ন শাস্ত্র—ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন যে, বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা যে পরম গতিলাভ হয়, সে গতি দান, তপস্যা যজ্ঞ, উপবাস, এবং ব্রতাদি আচরণেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই সাক্ষাৎ শঙ্কর অবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

বিদ্যাহিকা ব্রহ্মগতি প্রদায়া।
বোধোহিকো যত্তবিমুক্তি হেতু।

যে শিক্ষাতে ব্রহ্মের দিকে গতি করে তাহাকেই বিদ্যা বলে—অর্থাৎ ব্রহ্ম আরাধনা করিবার ভাবাই প্রকৃত। বিদ্যাপদবাচ্য অপর সবই অবিদ্যা। যে জ্ঞান লাভে ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য। অধুনা সে সকল মহাবাক্য স্বপ্নে পরিণত হইয়া তত্তৎস্থলে ঠিক তদ্বিপরীত ভাব অবলম্বিত হইতেছে।

এইখানেই আমাদের কলিকলুষ অর্জ্জনের প্রাথমিক ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে। যত-দিন না এই ভিত্তির সংশোধন হয়, ততদিন লক্ষ লক্ষ চেষ্টাতেও জনসাধারণের কোন প্রকার উপকার সাধিত হইবার প্রত্যাশা করা যাইতেই পারে না। অধুনা এই গভীর ও প্রকৃত তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করতঃ দৈনন্দিন সামাজিক অধঃপতনে মর্ম্মাহত হইয়া অনেক স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা বালক শিক্ষা এবং বালকরক্ষা বিষয়ক নানাপ্রকার প্রবন্ধ লিখন এবং উপদেশ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা কিন্তু তৎপূর্ব্বে অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষার ব্যবস্থা বিষয়ে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। কারণ যতদিন ভারতসন্তানের অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ প্রকৃত সৎশিক্ষা প্রাপ্ত না হইতেছেন, ততদিন বালকশিক্ষা ও বালক-রক্ষার চেষ্টা কার্য্যকরী হইবে না। কোমল প্রকৃতি বালক বালিকাগণ ঠিক কাঁচা মাটীর মত, যে ছাঁচ তাহাদের স্বভাব স্পর্শ করিবে—তৎক্ষণাৎ তাহারি ছাপ পড়িয়া যাইবে। এজন্য অভিভাবক এবং শিক্ষক যাঁহারা তাহাদের সম্মুখে আদর্শরূপে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল হওয়াই প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। আদর্শ—অনাচারী, মিথ্যাবাদী, রিপুপরতন্ত্র, মদ্যপায়ী প্রভৃতি অসদ্‌গুণ সম্পন্ন হইয়া কখনই সন্তানকে সদ্‌গুণ সম্পন্ন করিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যদিও কদাচিৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত বিরল। ফলতঃ আদর্শকে নীতিপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাস্থ্যরক্ষক, ন্যায়বান প্রভৃতি সদ্‌গুণ-শালী হইতেই হইবে। বালকবৃন্দ এক্ষণে কোমল প্রকৃতি বিধায় কাঁচা মাটীর তুল্য, সুতরাং তাহারা আদর্শ-পরিত্যাগে চরিত্রগঠন করিতে কদাচই পারিবে না। আর অভি-ভাবক ও শিক্ষকগণ এক্ষণে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া পাকিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা চেষ্টা এবং অভ্যাস দ্বারা স্ব স্ব স্বভাব অনায়াসেই জ্ঞানপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিয়া আদর্শ সাজিতে পারিবেন। এইরূপে তাঁহারা আদর্শ না সাজিলে অন্য কোনো উপায়ে, কোন প্রকার তীব্র শাসনে বালক-চরিত্র সংশোধন হইতে পারিবে না।

বালক যখন বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ পড়ে, তখন তাহাকে পড়ান হয় যে, "মিথ্যা কথা কহা বড় দোষ." কিন্তু তাহারা জানে যে, উহা পড়িয়া কণ্ঠস্থ করার দরকার কেবল পরীক্ষায় পাশ হইবার জন্য। আর কাজের বেলায় মিথ্যা কথা বলাই আবশ্যক। কারণ অভিভাবক এবং শিক্ষকগণের নিকট কার্য্যতঃ সে ঐরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াই অনুকরণ করিয়া থাকে।

আধুনিক বিদ্যালয়সমূহে পারিতোষিক বিতরণের দিনে সর্ব্বকার্য্যের শেষ ভাগে "বালকগণের প্রতি উপদেশ" শীর্ষক একটী ধারা নির্দ্ধারিত থাকে। এই ধারাকে আমরা ততটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি না। কেননা বালকগণ বৎসর ব্যাপী বহু উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা দিয়াছে, আজ তাহারি পারিতোষিক বিতরণে উৎসাহ প্রদানের দিন, আজিকার ক্ষণিক উপদেশ তাহাদের কর্ণে আদৌ প্রবেশের অবসর পাওয়া স্বাভাবিক হয় না।

যেহেতু তাহারা পারিতোষিক-আনন্দে অন্যমনস্ক আছে। তৎপরিবর্ত্তে এই ধারায় শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের প্রতি উপদেশ দিবার ব্যবস্থা থাকাই নিতান্ত দরকার। কারণ তাঁহাদের এ সুযোগ আর বৎসরের মধ্যে কোন দিনই ঘটে না।

বালক বালিকাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বভাব সম্পন্ন করিয়া তুলিতে প্রত্যেক অভিভাবক ও শিক্ষকই ইচ্ছা করেন, কিন্তু কিরূপ আদর্শ তাহাদের সম্মুখীন থাকিলে যে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় একথা অনেকেই চিন্তা করেন না। অভিভাবকগণ বালককে স্কুলে পাঠাইয়া এবং গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত, আর স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ পুস্তকে ছাপার লেখাগুলি কোনমতে কণ্ঠস্থ বা গলাধঃকরণ করাইয়া পরীক্ষায় পাশ করাইতে পারিলেই দায়ীত্ব হইতে খালাস, বস্তুতঃ বালক যে কিরূপ কিম্ভূত কিমাকার চরিত্রগঠন করিয়া সমাজে দণ্ডায়মান হইল তাহার দিকে কাহারো ভ্রূক্ষেপই নাই। বালকগণও কেবল মুখস্থের জোরে অথবা প্রশ্ন চুরি করিয়া কিম্বা ঘুঁসঘাঁসের বন্দোবস্ত করিয়া কোনমতে পাশ করিবার চেষ্টাতেই বদ্ধপরিকর। কারণ যেকোনরূপে পাশের ডিগ্রিখানা গুছাইতে পারিলেই তিনি লোক-সমাজে "সবজান্তা"রূপে দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন। এ বিশ্বাস তাঁহার পিতামাতা ও অভিভাবক এবং শিক্ষকগণকে সহ তাঁহার নিজত্বকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান তাহাই কার্য্যেও পরিণত করিতেছেন। তজ্জন্যই জনসমাজও সর্ব্ব-প্রকারে অধঃপতিত হইতেছে।

সেই নিমিত্ত আমাদের মনে হয়, এক্ষণে যদি সাবেককালের মত সুস্থ দেহ, তেজঃ-বীর্য্য ও দীর্ঘায়ু, মেধাবী, ধর্ম্মপরায়ণ, ও প্রকৃত বিদ্বান লোক প্রস্তুত করিয়া দেশের উন্নতি করিতে হয়, তবে পরবর্ত্তী বংশের নিকট আকাঙ্ক্ষিত গুণরাজি নিজ-দিগের মধ্যে প্রথমে শিক্ষার্থী সাজিয়া প্রাচ্য-শাস্ত্রের সদুপদেশ গ্রহণে সর্ব্বপ্রকার সদাচরণ আরম্ভ করিতে হইবে। "নিজে কিছুই করিব না—কেবল সন্তানকেই শিক্ষা দিব" এই অসার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যাইতে বা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং আমা-দিগের পূর্ব্বালোচিত প্রাতঃরুত্থানাদি প্রথম যামার্দ্ধকৃত্য হইতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের যাবতীয় উপদেশ শিক্ষক ও অভিভাবক এবং স্কুল কলেজের "ইন্স্পেক্টার" প্রভৃতি উচ্চ-কর্ম্মচারীগণকে সমাদরে প্রতিপালন করিতে হইবে। নতুবা দুই চারিটী বক্তৃতা দিয়া বা দু'দশটি প্রবন্ধ বা পুস্তক লিখিয়া অথবা তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া কেবল মাসিক বেতন গ্রহণে পূর্ণ স্বার্থপর থাকিয়া সমাজ নেতৃত্ব লাভ করা চলিতেই পারিবে না।

সদাশয় গবর্ণমেণ্ট যখন কার্য্যক্ষমতা, বুঝিবার জন্য শিক্ষার ভার ভারতবাসীর কর্ত্তৃত্বেই ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন এই ত সুবর্ণ সুযোগ। এই সময়ে বহু পরীক্ষিত আর্য্যপন্থার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা নেতৃবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অভিভাবক এবং শিক্ষক সম্প্রদায়কে সেই সকল বিষয়ের আদর্শ হইতে হইবে—নতুবা সবই নিষ্ফল।

পল্লীগ্রাম ও ম্যালেরিয়া।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পল্লীস্বাস্থ্য লইয়া অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলাম, আবার করিব। যাঁহারা সহরে বাস করেন,—সহরের কূপমণ্ডূক হইয়া যাঁহারা সহর ভিন্ন আর কোনো স্থানের কোনও খবর রাখেন না, পল্লীস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু পল্লীই হইতেছে দেশরক্ষার প্রধান উপায়। সহরে কলের জল, বা বৈদ্যুতিক আলোকে আমাদের সুখ-সুবিধার পন্থা পরিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবন ধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় ধান্য-কলায়-মুগ মসুরি—পল্লীর আবিল প্রান্তর ভিন্ন আর কোথাওতো উৎপন্ন হইবার উপায় নাই। সহরের মত পল্লীপ্রদেশে মণি-কাঞ্চনের সুলভতা নাই, কিন্তু স্বর্ণ রজত অলঙ্কার বিহীনা-পল্লীরাণীর অঙ্গলতা হরিৎ-শ্যামল শষ্প সম্ভারে যে সৌন্দর্য্য লইয়া বিরাজ করিতেছে, সে রূপলাবণ্যের সাধনা করিবার সৌভাগ্য লইয়া সকলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্যই বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করা যে কত দূর প্রয়োজনীয় তাহা আমরা চিন্তা করিবার অবসর পাই না।

কিন্তু সে চিন্তা আর না করিলে নয়, নানাকারণে বাঙ্গালার পল্লী গুলি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে, কাশীরাম দাসের ভিটা শ্বাপদ কুলের আবাস ভূমিহ ইয়াছে, 'ভারতের' জন্মভূমি প্রায় জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে নবদ্বীপ এক দিন সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি-পুরাণ, চিকিৎসা-জ্যোতিষের গর্ব্বে সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, রোগের জ্বালায় পিতৃপিতামহের ভিটার মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সেখানকার অর্দ্ধেক অধিবাসী আজি দেশত্যাগ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাসীগণ, বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রামনিবাসীগণ, নবীনচন্দ্রের দেশ বাসীগণ এখন আর কেহ দেশের খবর রাখেন না, কারণ রোগের পীড়নে দেশে থাকিবার উপায় নাই। জয়দেবের কেন্দবিল্ব গ্রাম—যে গ্রামে ভক্তের গৃহে একদিন স্বয়ং ভগবান আসিয়া "দেহিপদপল্লবমুদারম্" স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে গ্রাম আজি জন শূন্য। বোপদেবের ভিটা কেহ আর চাহিয়া দেখেনা। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস-জ্ঞান দাসের জন্মভূমি যে কোথায় ছিল—সে চিন্তা করিবার আবশ্যকতাও এখনকার দিনে কেহ মনে করে না।

কিন্তু কেমন হইল? কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আজি সোণার বাঙ্গালার অধিবাসীগণ দেশত্যাগী হইয়া পড়িল। সহরে আমাদের সুখ-সুবিধা যত প্রকারেই বর্দ্ধিত হউক না কেন, সহর হইতে কেহই কবি-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। স্মৃতির ব্যবস্থা, দর্শনের মীমাংসা, সাহিত্যের অনুশীলন—ইহাও আমরা সহর হইতে কোনওকালে প্রাপ্ত হই নাই। সহরে অর্থ যথেষ্ট আছে, সহর বাণিজ্যের বন্দর, বণিক সাজিয়া সহর হইতে অর্থ কুড়াইবার চেষ্টা কর, যথেষ্ট

পাইবে, কিন্তু সাহিত্যের সাধনা, ন্যায়ের সিদ্ধান্ত, জ্যোতিষের আলোচনা করিবার স্থান সহর নহে, বাঙ্গালার নিভৃত পল্লী ভিন্ন সে সকলের উর্ব্বর ক্ষেত্র সহরে কোনও কালে প্রশস্ত হয় নাই। আজি কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে পল্লী জননী তাঁহার কৃতী সন্তানদিগকে প্রবাসী সাজাইয়া দারুণ দৈন্য বেশ পরিগ্রহ করিলেন এবং আমরা চেষ্টা করিয়া আবার তাঁহার সেই হৃতশ্রী ফিরাইতে পারি কি না—এই সমস্যার সমাধান করাই কিন্তু এখন আমাদের সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সহরে বাস করার ফলে পেট ভরাইবার জন্য যাঁহারা পরের চিন্তায় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ঘরের খবর রাখিবার চিন্তা তাঁহাদের অনেকেরই নাই। অর্থের সাধনায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন্ কোন্ দেশ হইতে ধান্য উৎপন্ন হয়,—কেমন করিয়া কিরূপ ভাবে সে ধান্যরাশি হইতে আমরা আমাদের প্রধান আহারীয় দ্রব্য চাউল প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং অধুনা দেশে দিন দিনই যে সেই চাউলের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চেষ্টা করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে পারি কিনা—এ সব চিন্তা করিবার অবসর তাঁহাদের আদৌ নাই। অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, প্রবৃত্তি থাকিলে তো অবসর আসিবে।

এখন আমরা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষের বিচার না রাখিয়া সকলেই গতানুগতিক ভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করিয়াছি বটে, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যে দিন আমরা দাসত্বকে ঘৃণা করিতাম, জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সামাজিক বিধি উল্লঙ্ঘনের ভয়ে আতঙ্কিত হইতাম, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সকল জাতির লোকে একাকার পন্থা অনুসরণ করিতে শিহরিয়া উঠিতাম, শাস্ত্র মান্য করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া স্ব স্ব জাতির কর্ম্ম পালনে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। তখন দেশে অর্থ সুলভ ছিলনা, কিন্তু উদরান্নের সংস্থানের জন্য আমরা তখন তো দেশত্যাগী হই নাই। পল্লীপ্রান্তরের মুক্ত বায়ু তখন আমাদের যেরূপ ভাবে সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিত, সহরের সহস্র বৈদ্যুতিক ব্যজনীও তাহার সমযোগ্য নহে। স্বচ্ছ স্ফটিক তুল্য নদী-তড়াগের জল-প্রবাহ আমাদের যে স্নিগ্ধতা উৎপাদন করিত, সহরে কলের জলে সে স্নিগ্ধতার সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ণিমার চন্দ্র সহরেও প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু পল্লী ভিটার আঙ্গিনায় বসিয়া সেই প্রাকৃতিক শোভা যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, সে কখনই পূর্ণিমার চন্দ্র কিরণে যে কত মাধুরী,—তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সে কোকিলের কুহুরব, পাপিয়ার কলতান, ভ্রমরের মধু গুঞ্জন—পল্লীবাসী ভিন্ন কাহার শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারিয়াছে? আমরা একদা পল্লীরাণীর সেই সকল প্রাকৃতিক সুখ উপভোগ করিতাম। হায়, কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে সকল নষ্ট হইল?

অনেকে বলিবেন, ম্যালেরিয়ার জন্য আমাদের সে সুখ-সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে। অনেকটা একথা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। আমাদের দেশত্যাগী হইবার মুখ্য কারণ

আমাদের দাসত্বের স্পৃহা,—গৌণকারণ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছে ১৮০৪ খৃঃঅব্দে। মুর্শিদাবাদ ও কাশিম বাজারে এই রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়, কিন্তু তখন ইহার সামান্য সূচনা মাত্র। ঐ সূচনার ২০ বৎসর পরে যশোহর জেলার মহম্মদপুর আক্রমণের ফলে ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহা আমরা চিনিতে পারি। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে ইহার প্রথম সূচনা যে সময় হইয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় হইতেই আমাদের মনে চাকরি করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। সেই জাগরণই হইল আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। সেই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে রেল-ষ্টীমারের আবির্ভাব হইল, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইতে চলিল, দেশের লোকে অল্প স্বল্প ইংরাজী শিখিয়া মোটা মোটা মাহিয়ানার চাকরি পাইতে লাগিল। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সেই সময় সর্ব্ব-প্রথম বিদেশবাসী হইবার কামনা বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়া উঠিল। পল্লীজননীর কৃতীসন্তানগণ পল্লীমাতার অঙ্ক শূন্য হইবার ইহাই সর্ব্বপ্রথম কারণ। তাহার পর নানাকারণে দেশে ম্যালেরিয়ার বীজ শিকড় গাড়িয়া বসিল, কাজেই প্রবাসী বাঙ্গালী আর পল্লীভিটা চাহিয়া দেখিলনা, এমনই করিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলি হতশ্রী হইল। কাজেই বলিতেছিলাম, ইংরাজী শিখিয়া গোলামীর স্পৃহাই আমাদের পিতৃ পিতামহের ভিটাগুলি জনশূন্য হইবার মুখ্য কারণ এবং ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী পরিত্যাগের স্পৃহা আমাদের গৌণ কারণ।

স্বীকার করি—অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন ম্যালেরিয়ার ভয়ে। কিন্তু দেশে থাকিয়া সে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা কোনো চেষ্টা করিয়াছেন কি? যাঁহারা পেটের দায়ে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেশ ত্যাগের কারণ ম্যালেরিয়া নহে, কিন্তু যাঁহারা ম্যালেরিয়ার জন্যই দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, পল্লীর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা ছাড়িয়া সহরের অসূর্য্যম্পশ্য সৌধ গহ্বরে যাঁহারা সখ করিয়া আবাস স্থান নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা কি পল্লীভিটায় সন্ধ্যা আলিয়া প্রতিবাসী দিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এবং মহামান্য সরকার বাহাদুরের হস্তে সেই সংগৃহীত অর্থ প্রদানান্তর পল্লীর বন জঙ্গলগুলি কাটাইবার জন্য—পুষ্করিণী দীঘিকাগুলির পঙ্কোদ্ধারের জন্য—কর্দ্দমপঙ্কিল-সরসীগুলির সংস্কার সাধনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেন না? ম্যালেরিয়া বলিয়া আতঙ্কিত হইলে চলিবে কেন?—শত্রু শিবিরে, তাহাকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা কর, শঙ্কায় মূর্চ্ছিত হইলে চলিবে না।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ-অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায়, যে দেশ নিম্ন, যে দেশের ভূমি অধিকাংশ সময় সিক্ত, যে দেশে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা নাই এবং যে স্থান জঙ্গল বহুল,—ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সেই স্থানেই পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহাই যদি ম্যালেরিয়ার কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদের বঙ্গভূমিকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা করা কি বিশেষ কঠিন ব্যাপার? ম্যালেরিয়ার তাড়নে আমরা বঙ্গদেশের লোকই যে আজি নূতন বিপর্য্যস্ত এবং

ইহা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশকে ইতিপূর্ব্বে আক্রমণ করে নাই—তাহা নহে, বাঙ্গালা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও এই দুরন্ত রাক্ষসী সে সকল স্থানকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে সকল দেশের অধিবাসী দিগের চেষ্টা ও যত্নে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসী সে সকল স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে। ১৮৮০ সালে হ্যাভানার এই দুরন্ত দানবী মৃত্যু সদনে প্রেরণ করিয়াছিল ৩২৫ জনকে, ১৮৮৮ সালে ১০১, ১৮৯০ সালে ১৭০, ১৮৯৫ সালে ২০৬ ও ১৯০০ সালে ৩৪৪ জনকে শমন-সদনে প্রেরণ করে, কিন্তু ১৯০১ সালের পর হ্যাভানিয়ার প্রকৃতিপুঞ্জ ম্যালেরিয়া দমনের জন্য এরূপ তোর জোর করিয়া তুলিল যে, ১৯০৬ সালে ঐ রোগে মৃত্যু সংখ্যা হইল মাত্র ২৬ জনের। সুইডেনহামবন্দরেও ১৯০১ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৬১০, কিন্তু ঐ সময় হইতে চেষ্টা করিয়া ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা হইল মাত্র ২৩। হংকংয়ে ১৯০০ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৬৩, কিন্তু তাহার পর বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টায় ফলে ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়াইল মাত্র ৫৪। আমি ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত এখানে সম্পূর্ণ রূপে প্রদান করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা, আমার বক্তব্য ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার মত অন্যান্য প্রদেশকেও ইতঃপূর্ব্বে আক্রমণ করিয়াছিল এবং সে সকল দেশের অধিবাসীগণ তাহা দেখিয়া বাঙ্গালার পল্লীবাসীদিগের মত রণে ভঙ্গ দিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ণ করেন নাই, পরন্তু প্রভূত চেষ্টায় ঐ দুরন্ত ব্যাধিকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিবার জন্য উপরে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছি।

অন্যান্য দেশের লোক আমাদের মত বচনবাগীশ নহেন, তাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মের উপাসক, প্রকৃত উপাসকের সাধনা নিষ্ফল হইবার নহে, কাজেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। আর আমরা,—আমাদের পল্লী জননী এই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রতি বৎসর অসংখ্য অসংখ্য সন্তান-সন্ততির বিয়োগ ব্যথা অম্লান বদনে অনুভব করিতেছেন, যে মুষ্টিমের অপত্য—না মরিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে, তাহাদের পেট জোড়া প্লীহা, পার্শ্ব জোড়া যকৃত ও কুক্ষি জোড়া অগ্নমাস তাহাদের স্বাস্থ্যদৈন্যের অলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে,—যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সমুন্নত, তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ণ করিতেছেন, যাঁহাদের গত্যন্তর নাই তাঁহারা উপায় রহিত অবস্থায় ভিটায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়া নিজেদের আয়ু প্রদীপ নির্ব্বান প্রায় করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের দেশে Ronald Ross জন্মগ্রহণ করেন নাই, ডাক্তার সিলিও আমাদের দেশের ননেন, ডাঃ ষ্টীকেন এবং ক্রিষ্টোফারও আমাদের দেশে নাই, জার্ম্মানীর গুধী অধ্যাপক কক (Kocu) ও আমাদের দেশের নহেন, সুতরাং তাঁহারা আমাদের এই ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট দেশের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের দেশের মত ম্যালেরিয়া দূর করিবার উপদেশ প্রদান না করিলেও আমাদের দেশেও তো মনস্বীদিগের অভাব নাই, মাননীয় পি, সি, রায়, সার জগদীশ চন্দ্র

বসু, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য যদি চিন্তা করেন, তাহা হইলে আমাদের দেশ হইতে কি ম্যালেরিয়ায়-মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে না? বাঙ্গালার দেশের কথা চিন্তা করেন এমন মনস্বী আরও অনেক আছেন, তাঁহারাই বা এ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিতেছেন? আসল কথা, এরূপ একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় চিন্তা শুধু কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেই চলিবেনা, অথবা গগনভেদী বক্তৃতার জোরে শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করিলেও চলিবেনা,—এই চিন্তার ফলে পল্লীর কৃতী সন্তানগণ যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চিরকালের মত পল্লীমায়া বিসর্জ্জন দিয়া সহরপ্রবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুনয় করিয়া—বিনয় করিয়া—তাঁহারাই পল্লীর আশা-ভরসা—সহায় সম্বল—এ সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে তাঁহারা আপন-আপন পল্লীর উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হন—তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা অর্থ প্রদান করুন, যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা শক্তি প্রদান করুন, যাঁহাদের কর্ত্তব্য বোধ আছে তাঁহারা দায়ীত্ব গ্রহণ করুন,—এইরূপে যাঁহার যতটুকু শক্তি—যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা—তিনি ততটুকু আপন পল্লী রক্ষার জন্য যদি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে এই দুরন্ত দানবীর সহিত যুদ্ধে যে অন্যান্য দেশের মত আমরাও জয়ী হইব—তাহা অবিসম্বাদিত।

আমরা সহরে বাস করিতেছি, কিন্তু সহরেও তো রোগের জ্বালা কম নহে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া সব চেয়ে বড় ব্যাধি, কিন্তু সহরে সব চেয়ে বড় ব্যাধি হইতেছে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ। সহরের বদ্ধ বায়ু, কলকারখানার ধোঁয়া এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচারশূন্যতা—মোটামুটি এই কয়টি কারণে আমরা সহরে থাকিয়া যক্ষ্মাগ্রস্থ হইয়া পড়িতেছি। যক্ষ্মাগ্রস্ত হইবার আরও অনেকগুলি কারণ আছে—কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়া সে সকল পরিচয় এখানে নাই প্রদান করিলাম। যাহা হউক মফঃস্বলের ম্যালেরিয়ার মত সহরেও যক্ষ্মারোগ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ভিন্ন সহরে সকল প্রকার ব্যাধিই বারমাস লাগিয়া আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, কলেরা নিউমোনিয়া—কাহাকে ফেলিয়া কাহার কথা বলিব? এক কথায় বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সহর কলিকাতা তো এখন সকল রোগের আকরভূমি। ইহার উপর কলিকাতার বাসাবাড়ীর কথা আর নাই তুলিলাম। ফলে কলিকাতার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে—তাহাতে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—অনেককে আবার পল্লীভিটায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাহাই যদি আর কিছুদিন পরে করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আর বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংস করিয়া লাভ কি? এখন হইতে কায়মনোবাক্যে পল্লীসংস্কারে মনোযোগী হইয়া যাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আবার সেকালের মত সুখসমৃদ্ধিতে কাটাইতে পারে—তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে কি? আমাদের অবশ্য ব্যবহার্য্য চাউলের মূল্য দশটাকা

একরূপ নির্দ্দিষ্ট ভাবেই দাঁড়াইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ ইতিপূর্ব্বে তো বলিয়াছি— আমরা অনেকেই চাউলের উৎপত্তির বিষয় অবগত নহি, বাজার রহিয়াছে যখন যে দরই হউক কিনিয়া আনিতেছি, রন্ধন হইতেছে, আহার করিতেছি—এইতো আমাদের চাউলের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁহারা এরূপ সম্বন্ধ স্থাপনে কাতর নহেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এ সম্বন্ধ যে বিশেষ দুর্ব্বিষহ তাহাতে তো কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতি সেই অতীত যুগের অসভ্য প্রথার পল্লী প্রান্তরে আবার কৃষি কর্ম্মে মনঃসংযোগ না করিবে সে পর্য্যন্ত যে তাহার পক্ষে এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী চাকরিই করুক আর যাহাই করুক, বাঙ্গালী যে এখন 'হাভাতের' দল হইয়াছে। বাঙ্গালীর অধিকাংশ ব্যক্তিই আগে চাকরি করিত না বটে, কিন্তু তখন তাহাদের চাষে ধান্য হইত, মাঠে ফসল হইত, ক্ষেত্রে তরকারী জন্মিত, পুষ্করিণীতে মৎস্যের অভাব ছিল না। তাহার ফলে তখন বাঙ্গালী এখনকার মত 'হাভাতের' দল হয় নাই। চাকরির স্পৃহাতেই বল, আর ম্যালেরিয়ার তাড়নেই বল, আর সখ মিটাইবার জন্যই বল, বাঙ্গালী পল্লী ছাড়িয়া—সেকালের বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিয়া আপন কর্ম্মদোষে স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরিতেছে। কে আছ দেশের আশা ভরসা,—বাঙ্গালীর এই দারুণ দুর্গতির দিনে বাঙ্গালী জাতিকে তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া,—তাহাকে তাহার অনেক কালের অভ্যাস পরিত্যাগ করাইয়া পল্লী পরিত্যাগই যে তাহার আজি চরম দুর্গতির কারণ তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া—আবার তাহাকে স্বপথে আনিয়া তাহার উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করিবে ভাই! যিনি এই কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন—আমরা তাঁহাকে কোটী ধন্যবাদ দিব, বিশ্বসংসার তাঁহার গুণগাথা গাহিবে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁহার নাম অবিনশ্বর ভাবে কীর্ত্তিত হইবে। যদি কাহারও সাহস থাকে, এস—বাঙ্গালী জাতিকে আবার নিজের পথ দেখাইয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা কর।

এইবার দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন কি করিয়া হইতে পারে, সেই কথাটা বলিব। পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইলে আমাদিগকে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, পল্লীগ্রামে ফিরিয়া না যাইলেও আমাদিগকে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বৎসরের শতকরা ৩০ জনেরও অধিক লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মরিয়া থাকে। একি মৃত্যু! জগতের কোন দেশের লোক তো এরূপভাবে মরণের পথ পরিষ্কার করে না।

আমরা পল্লী ছাড়িয়াছি, কিন্তু যাহারা আমাদের ভিটায় সন্ধ্যা জ্বালিয়া এখনো পল্লীর অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, চৈত্রের কাটফাটা রৌদ্র, শ্রাবণের অবিরাম বারিধারা, পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যাহারা দেশের জন্য—জাতির জন্য পল্লীপ্রান্তরে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বপ্রকারে শস্য উৎপাদনের প্রয়াস করিতেছে, নিরক্ষর অসভ্যজাতি বলিয়া উপেক্ষার হাস্যে আস্য বিকাশপূর্ব্বক

তাহাদের মরণ তো চাহিয়া দেখিলে চলিবে না! তোমার আমার দেশ রক্ষার চেষ্টা অপেক্ষা তাহারা যে সত্য সত্য কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করিতেছে—এ কথাটা এখন আর মর্ম্মে মর্ম্মে না বুঝিলে চলিবে না, বৎসরে শতকরা যদি ৩০ জন কৃষক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালাকে বাঁচাইবার আর উপায় থাকিবে না—ইহা ধ্রুব সত্য। পল্লী প্রান্তরের কৃষককুল নিরক্ষর হউক, অসভ্য হউক, কিন্তু তাহারাই হইতেছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবার একমাত্র ভরসা। তাহারা কুশলে থাকিলে তবে বাঙ্গালার সকল জাতি কুশলে থাকিবে, তাহারা রক্ষা পাইলে তবে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা পাইবে। বঙ্গের কৃতী পুরুষগণ, তোমরা জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাও আর না যাও, তোমরা অগ্রণী হইয়া দুরন্ত ম্যালেরিয়ার হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। তাহাদের আবাসস্থানের পার্শ্বস্থ বন জঙ্গলগুলি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, তাহাদের আবাস স্থানের পার্শ্বস্থ নালা ডোবাগুলি বুজাইয়া দিবার বন্দোবস্ত কর, তাহাদের পানীয় জলের দুর্গতি দূর করিবার জন্য তাহাদের রুদ্ধপ্রায় জলাশয়গুলির সংস্কারসাধনের ব্যবস্থা কর, তাহাদের পানার্থ যে জলাশয়গুলি নির্দ্দিষ্ট,—সেগুলিতে পাট পচাইয়া যাহাতে কেহ সে জল কলুষিত না করে, তাহার ব্যবস্থা কর—দেখিবে তাহাদের আবাসভূমি আবার স্বাস্থ্যনিকেতন হইয়া উঠিবে—পল্লীর সুখসৌভাগ্য অতীতযুগের শান্তিবহন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে, রূপার পৈঁছা-তাবিজে বাহুলতার শোভা বৃদ্ধি করিয়া পল্লীগ্রামের কৃষাণীকুল আকুল হইয়া আবার কৃষকের আনীত শস্য আঙ্গিনাপ্রদেশে বিস্তারণপূর্ব্বক রৌদ্রে দিবার জন্য ব্যগ্রস্বভাবা হইয়া উঠিবে।

উপরে যে চিত্রের কথা উল্লেখ করিলাম—ইহা আমাদের কল্পনার চিত্র নহে—সত্য সত্য বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে একদিন ঘরে ঐরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত। কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইত, সেগুলি পরিপক্ক হইলে কাটিয়া আছড়ান হইত, তাহার পর শস্যসম্ভার পৃথক পৃথক করিয়া লওয়ার পরে যখন সেগুলিকে গৃহে আনা হইত—তখন কৃষাণীই সে শস্যরক্ষার অধিকারিণী হইতেন। কৃষাণী সেগুলিকে রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইয়া কতকাংশ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া তদ্দ্বারা তৈল লবণ প্রভৃতি সাংসারিক দ্রব্য সকল ক্রয় করিতেন। হৈমন্তিক ধান্য যখন এইরূপে গৃহজাত হইত—তখন সকল গৃহেই কি এক অভূত আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইত। এখনকার নবান্ন, এখনকার পৌষপার্ব্বণ—সে তো বাঙ্গালীর পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র,—একটা শুভদিন দেখিয়া বাজার হইতে নূতন চাউল কিনিয়া আনিয়া এখন আমরা যেমন নবান্নের আয়োজন করি, পৌষপার্ব্বণের ঘটাও এখন আমাদের সেইরূপ। কিন্তু সেকালে কৃষক যখন সারা বর্ষের শ্রম সফল মনে করিয়া নূতন ধান্যরাশির স্তূপে আঙ্গিনা প্রদেশ আলোকিত করিত—তখনই কৃষাণী সেই ধান্যে নবান্নের

উৎসবের আয়োজন করিত। সে এক কি আয়োজন! পুরোহিত ডাকা হইত, মন্ত্র-পাঠ হইত, প্রতিবাসী আত্মীয়স্বজনবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হইত, তবে সে নবান্নের ব্যবস্থা সিদ্ধ হইত। বাঙ্গালার পৌষপার্ব্বণও ছিল—ঐ নূতন ধান্য উৎপন্নের পরে। এখন সে নবান্নের ঘটাও নাই, পৌষ পার্ব্বণের উৎসবও নাম মাত্র আছে।

যাক্ সে কথা। এখন হইতেছে বাঙ্গালার আবার সেই অতীব যুগ ফিরাইয়া আনিবার কথা, বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা, বাঙ্গালার পল্লীভূমি হইতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দূর করিবার কথা। পরীক্ষাদ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, মশকদংশনই ম্যালেরিয়া আক্রমণের সর্ব্বপ্রধান কারণ। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ডাঃ ম্যানসনই একথা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ইহার পর ডাঃ রস ১৮৯৭—৯৯ খৃঃ অব্দে স্পষ্ট দেখাইয়া দেন যে, কতকগুলি মশক নরশোণিত হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রাপ্ত জীবাণু ভ্রূণ উদরস্থ করিয়া স্যুঁয়াল জীবাণু বংশ উৎপন্ন করিতেছে। ইহার পর ডাঃ লো ও সামবিল প্রভৃতি ইটালী প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লোক সমাজে প্রকাশ করেন। ফলকথা মশকই হইতেছে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ। যে সব দেশে মশক নাই সে সব দেশে ম্যালেরিয়াও নাই। দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে দেশ হইতে আগে মশকবংশ নির্ম্মূলের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—স্বল্পতোয়া নদী-সরিৎগুলি, পুরীষ কর্দ্দম পরিপ্লুত খাল বিল ডোবাগুলি, গৃহ-পার্শ্বস্থ গর্ত্ত ও নালাগুলিই হইতেছে মশক বিস্তৃতির সর্ব্বপ্রধান স্থান—সেগুলির সংস্কার সাধনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তা' ছাড়া যাহাতে পল্লীবাসীমাত্রেই গ্রীষ্মের দিনে দাওয়ায় পড়িয়া মুক্ত বায়ুতে আরাম সুখ উপলব্ধি না করে—তাহার জন্য উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাহারা যাহাতে মশারি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বর্ষার সময় স্বভাবতঃই জল দূষিত হয়, এজন্য গরম জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদিগকে পরামর্শ দিতে হইবে—সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে সরিষা তৈল মর্দ্দন—নানা রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক—এ কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে।—কৃষকদিগের পক্ষে আর স্বতন্ত্র ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না—কর্ম্মসূত্রে তাহারা যে ব্যায়াম করে তাহাই যথেষ্ট, কিন্তু কৃষিজীবি বা অন্যান্য শ্রমজীবী ভিন্ন যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে যে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম করা একান্ত প্রয়োজন—একথা পল্লীবাসীর সকলকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে।—ফলে এই সকল ব্যবস্থা যদি পল্লীগ্রামে কেহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যে বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া যাইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক হইবেন কে?—তাহাই তো চিন্তা! কে এমন কর্ম্মবীর আছেন—যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এই ম্যালেরিয়া নিবারণের তথ্য পল্লীবাসী-দিগকে বুঝাইয়া দিবেন? বাঙ্গালাগবর্ণমেণ্ট

অবশ্য নিশ্চিন্ত নাই, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা নিজেরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কর্ম্মফল যে আরও সুন্দর হইবে, তাহা নিশ্চিত। সেইজন্য বলিতেছি,—কে আছ মহাপ্রাণ বাঙ্গালীর গৌরব! এস ভাই,—বাঙ্গালী জাতির এই দারুণ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী জাতিকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হও,—মৃতকল্প বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা কর। যে জাতির একদিন বল ছিল, বিক্রম ছিল, সাহস ছিল, শক্তি ছিল,—যে বাঙ্গালায় একদিন আশানন্দের মত বীর, বৈদ্যনাথ-বিশ্বনাথের মত পরাক্রমশালী লোকের অভাব ছিলনা, যে জাতির লোক একদিন অক্ষতস্বাস্থ্যে বিজ্ঞানোলোচনায় সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল,—যে জাতি দেশের জন্য—দশের জন্য—রাজার জাতির সাহায্যের জন্য—পক্ষান্তরে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য ব্রিটিশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে যাইতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই,—এস ভাই বাঙ্গালীর কৃতীসন্তান! সেই দেশকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, সেই বাঙ্গালীকে বাঁচাইতে চেষ্টা কর—সেই বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পল্লীর পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা কর;—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অমোঘ আশীর্ব্বাদ দেবনির্ম্মাল্যের মত তোমার মস্তকে পতিত হইবে,—তুমিই বাঙ্গালীজাতির রক্ষার কারণ হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।—নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলন হইতে একটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠা হইবে। কথা উঠিয়াছে কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সহিত উহা মিশাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী একটি কলেজের ব্যবস্থা হউক। ভাল কথা।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে আয়ুর্ব্বেদের সাহায্য।—যশোহর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সেখানে "আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পাঠকগণ জানেন। কুমিল্লা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে ২০৲ টাকা স্কলারসিপ দিয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ কলেজে একজন ছাত্রকে পাঠান হইয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের নিকট প্রতাপগড়ের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সেখানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিবেন বলিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র চাহিয়াছেন। ভারতে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-বিস্তৃতির পন্থা সুগম হইতেছে বলিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি বিধানের জন্য মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয় কলিকাতা মহানগরীতে একটি আয়ুর্ব্বেদ সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাতার পরলোক গমনের পর সভাটি ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। কুমারটুলীর বর্ত্তমান কবিরাজ মহাশয়দিগের প্রভূত চেষ্টায় উহাকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করা হয়। এখন সভার অবস্থা

যথেষ্ট উন্নত, অনেক চিকিৎসকই স্বেচ্ছাক্রমে ইহার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতেছেন। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস মহাশয় গত বৎসর হইতে ইহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া তদ্বিষয়সম্ভাষা নামে সকল প্রকার চিকিৎসার আলোচনা যাহাতে সম্যকরূপে হইতে পারে, সভায় সেই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়ের এইরূপ একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই সভ্যগণের অনুরাগ বৃদ্ধির বিশেষ কারণ। অধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির ফলে এ বৎসরও উক্ত মহামহোপাধ্যায় সভাপতির পদে বরিত হইয়াছেন। আমরা এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবিদ্ চিকিৎসক-শিরোমণির নিকট সভার উন্নতিকল্পে অনেক বিষয়ের আশা করি।

'আয়ুর্ব্বেদ সভার' কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য।—বর্ত্তমান ১৩২৭ সালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—১। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস সভাপতি, ২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম-এ, এম-বি, সহঃ সভাপতি, ৩। শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি সহঃ সভাপতি, ৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন সহঃ সভাপতি, ৫। শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ সহঃ সভাপতি, ৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, কবিরত্ন সহঃ সভাপতি, ৭। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন সহঃ সভাপতি ও গ্রন্থাধ্যক্ষ, ৮। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন সেন কবিভূষণ, কোষাধ্যক্ষ, ৯। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সম্পাদক, ১০। শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন কবিভূষণ, সম্পাদক, ১১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্ত কবিরত্ন, ১২। শ্রীযুক্ত অমুতোষ সেন, ১৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রসেন বি-এ, ১৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ, ১৫। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসন্ন সেন, ১৬। শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ, ১৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত, কবিরঞ্জন, ১৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, ১৯। শ্রীযুক্ত গুলরাজ গোস্বামী, ২০। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত জগদানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ২১। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাব-পরীক্ষক, ২২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন হিসাব পরীক্ষক, ২৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস, ২৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিয় মাধব মল্লিক এম, বি, ভিষকরত্ন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে" এবার যে সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি বি,এ, এবং আই, এ উপাধিযুক্ত। অনেকগুলি সংস্কৃতবিদ্ ছাত্রও এই বিদ্যালয়ে এবার প্রবেশাধিকার লইয়াছেন। কলেজ-কাউন্সিলের নূতন নিয়মে এবার ৬ মাসের করিয়া বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল,—আনন্দের কথা এই যে, অনেকেই সে ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া ৬ মাসের বেতন দিয়া এই কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। এইবার এ বিদ্যালয় ৪র্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিল। ভগবান যে ইহার ক্রমোন্নতি করিতেছেন, ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা।

কলিকাতা "আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজের" বার্ষিক পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ৪র্থ হইতে ৫ম বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

১। বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত
২। প্রমথ নাথ দত্ত গুপ্ত
৩। জি, পি, বিক্রমার্চ্চি
৪। রাজেন্দ্র চন্দ্র দাস গুপ্ত
৫। হেম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৬। সতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত
৭। প্রফুল্ল নাথ রায়
৮। যোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
৯। জ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত
১০। কিরণ্ময় দাশ গুপ্ত
১১। গৌর দাস অধিকারী
†১২। ধনঞ্জয় সেনগুপ্ত
†১৩। মণীদাস রাজপক্ষ

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ৩য় হইতে ৪র্থ বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

* ১। কৃষ্ণ কুমার সাহা
২। জিতেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত
৩। অবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত
৪। তুলসী চরণ হালদার
৫। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৬। রাজ সিংহ বৃদ্ধদাস
৭। অশ্বিনী কুমার চৌধুরী
† ৮। পরমানন্দ শর্ম্মা
*৯। লাল বিহারী টিকাদার
১০। বি, এল, ডব্লিউ, বিমলা জীউ
†১১। গোপাল চন্দ্র গোপ

* চিহ্নিত ছাত্র ১ মাস পরে বিষতন্ত্রের লিখিত পরীক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইলে ৫ম বর্ষে উন্নীত হইবে।

* এই ছাত্রগণকে সাধারণভাবে উত্তীর্ণ করিয়া লওয়া হইল।

† এই ছাত্র দিল্লী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হইতে চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল এবং এ বৎসরের পরীক্ষায় সার্জ্জারীতে ১ম স্থান অধিকার করায় ৫ম বর্ষে উন্নীত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ২য় হইতে ৩য় বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

১। শচীন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
২। নরেন্দ্র নাথ রায় চট্টোপাধ্যায়
৩। নীলকণ্ঠ দাস আইচ
৪। প্রভাত কুমার চক্রবর্ত্তী
† ৫। টি, এম, বি, কুরে

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১ম হইতে ২য় বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

১। রমেশচন্দ্র পাল
২। ইন্দু ভূষণ সেন গুপ্ত
৩। নীরদ চন্দ্র সেনগুপ্ত
৪। সুধাংশু ভূষণ মুখোপাধ্যায়
৫। ভবেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৬। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, উপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়
৭। দ্বিজেন্দ্র কিশোর রায়
৮। রাজেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
৯। ক্ষীরোদ মোহন রায়
১০। অশ্বিনী কুমার দেব নাথ
১১। রমেশচন্দ্র লাহিড়ী
১২। সুশীলপতি রায়
১৩। কালী কৃষ্ণ কর্ম্মকার
১৪। অবনী ভূষণ গুপ্ত
১৫। বৈদ্য নাথ রায়
১৬। সত্য চরণ বসু
১৭। দুর্গা প্রসন্ন সেন
১৮। ধরণী ধর সেন
১৯। যতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত
* ২০। মনোমোহন দাশগুপ্ত
* ২১। নিরঞ্জন দাশগুপ্ত
২২। সি, শম্ভুশিব আয়ার
২৩। পূর্ণ চন্দ্র পাল
† ২৪। গণনাথ শর্ম্মা
† ২৫। শ্রীশচন্দ্র দাস
†২৬। ভবেশচন্দ্র রাজখোয়া
†২৭। মহাবলা শেঠী
†২৮। বি, পি, রণতুঙ্গ
†২৯। বদ্রিপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী।

* চিহ্নিত ছাত্রদ্বয়কে ১ মাস পরে দ্রব্য-গুণের পরীক্ষায়পার দর্শিতা দেখাইতে হইবে।

† এইরূপ চিহ্নিত ছাত্রগণকে সাধারণভাবে উত্তীর্ণ করিয়া লওয়া হইল।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

(কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত)

বাধক রোগে। (১) মুসব্বর ও হিং—সমান ভাগে মিলাইয়া প্রত্যহ প্রাতে ২ রতি মাত্রায় কিছুদিন সেবন করিলে রজঃকৃচ্ছ্রতা আরোগ্য হয়। (২) ওলটকম্বলের মূলের ছাল দুই আনা ও গোলমরিচ ৩টি, একত্র জল দ্বারা বাটিয়া ঋতুর তিন দিবস প্রাতে ও বৈকালে ২বার সেবন করিলে বাধক বেদনার শান্তি হয়। (৩) সোহাগার খই, হিং মুসব্বর ও হীরাকস—সমানভাগে লইয়া ঘৃত-কুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় জলের সহিত সেবনে বাধকবেদনা নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়ায়।—আদার রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে মূর্চ্ছা নিবারিত হয়। (২) মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও বচ একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়। (৩) কাগজ চুরুটের মত প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম নাসিকায় ধরিলে মূর্চ্ছা শীঘ্র নষ্ট হয়। (৪) রসুনের রসের নস্য প্রদান করিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। (৫) মরিচ পোড়াইয়া তাহার ধূম নাকে লাগাইলে মূর্চ্ছার অপনয়ন হয়।

শ্বাস বা হাঁপানিতে।—(১) বহেড়া বীজের শাঁস ৪।৫টা—।০ আনা—পরিমিত মিছরির জলে মিশাইয়া পান করিতে দিলে শ্বাসের কষ্ট প্রশমিত হয় (২) বহেড়া চূর্ণ ৵০ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাসের কষ্ট বিদূরিত হয়। (৩) পুরাতন গুড় ও সর্ষপ তৈল সম-জলে মিশাইয়া সেবন করাইলে শ্বাসের কষ্ট নিবারিত হয়।

প্রমেহ। (১) কচি বাবলা পাতা চারি আনা ওজনে লইয়া মধুর সহিত পিষিয়া সেবনে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়। (২) কাঁচা হরিদ্রার রস ১ তোলা, যজ্ঞডুমুরের রস ১ তোলা ও চিনি চারি আনা একত্র কয়েক দিন সেবনে প্রমেহের জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয়। (৩) গুলঞ্চ, আমলকী গোক্ষুর ও কাঁচা হরিদ্রা ইহাদের এক একটি ॥০ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০—এই কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রমেহ পীড়ার শান্তি হয়।

IMPERIAL LIBRARY.